কাঙ্ক্ষিত জীবন

কাসেম বিন আবুবাকার

(১) "মানুষ কি তাহার প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পায়? পরন্তু আল্লাহরই আয়ত্তধীনে আছে পরলোক ও ইহলোক।"

আল-কুরআন, সূরা নজম, আয়াত-২৫ থেকে ২৬, পারা-২৭।

(২) "পাপের কাজ করে লজ্জিত হলে পাপ কমে যায়। আর পূণ্য কাজ করে গর্ববোধ করলে পূণ্য বরবাদ হয়ে যায়।"

–হযরত আলি (রাঃ)

(৩) "মানুষের জীবন একটা সমুদ্রের ন্যায়, আখেরাত তার কিনারা এবং তাকওয়া (আল্লাহভীতি) নিরাপদে কিনারায় পৌঁছানোর জন্য নৌকা বিশেষ।"

–মারুফ কারখী (রঃ)

যখন বিলকিস বানু অ্যাব-নরম্যাল হয়ে পড়েন তখন থেকে তার চিকিৎসা করে আসছেন। তিনি জানেন, বিলকিস বানু প্রেসারের রোগী। তাই তার মেয়ের কথা শুনে প্রেসার মাপার যন্ত্রটা নিয়ে আফিয়ার সঙ্গে রিকশায় উঠলেন। তারপর বললেন, কাল তো প্রেসার চেক করে এলাম, প্রায় নরম্যাল ছিল। আজ কোনো কারণে উনি কি উত্তেজিত হয়েছিলেন?

আফিয়া ভার্সিটি থেকে ফেরার পর যা ঘটেছে সব বলল।

জাহানারা বেগম বিলকিস বানু ও তার স্বামীর সব হিস্ট্রী জানেন। তাই বুঝতে পারলেন, বিলকিস বানু মেয়ের কথা শুনে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। বাসায় পৌঁছে প্রেসার মেপে বললেন, প্রেসার একটু বেড়েছে। সেই জন্যে উত্তেজিত হয়ে পড়ায় এ রকম হয়েছে। তারপর পাল্‌স্ দেখে ও বুকে স্টেথিস্‌কোপ বসিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, না, ভয়ের কোনো কারণ নেই। উনি এখন ঘুমাচ্ছেন। ঘুমের ডিস্টার্ব করবেন না। এখন ঘুমান অত্যন্ত দরকার। অন্য কোনো ওষুধ লাগবে না। যা আছে চলবে। কিছুক্ষণ ঘুম হলে ঠিক হয়ে যাবে। ফেরার সময় আফিয়াকে ডেকে বারান্দায় এসে বললেন, তুমি ঐ ছেলেটার ব্যাপারে তোমার আম্মুকে কোনোদিন কিছু বল না। আর তুমিও তার সঙ্গে মেলামেশা করো না। তারপর চলে গেলেন।

আফিয়া কিছু না বলে আম্মুর কাছে ফিরে এল।

সায়রা বানু আফিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই নাশতা খেয়েছিস?

আফিয়া বলল, না।

সায়রা বানু বললেন, আমি মর্জিনাকে নাশতা দিতে বলে নিচে যাচ্ছি। হাতের কাজ ফেলে এসেছি। দরকার হলে আমাকে ডাকবি।

আফিয়া নাশতা খেয়ে আম্মুর পাশে বসে মনে মনে আল্লাহপাকের কাছে তার সুস্থতার জন্য দো'য়া করে চিন্তা করল, আম্মু তার কথা শুনে এত রেগে গেল কেন? তখন নিয়াজের সঙ্গে তার কি করে পরিচয় হল এবং আজ লাইব্রেরীতে দেখা হওয়ার পর যা ঘটেছে, তা একের পর এক মনে পড়তে লাগল।

আফিয়ার সঙ্গে নিয়াজের প্রথম পরিচয় হয় ডিবেটিং ক্লাসে। সেদিন অনার্সের প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বর্তমান সমাজের অবক্ষয়ের কারণ ও তার প্রতিকারের উপায় নিয়ে ডিবেট হয়েছিল। দু'পক্ষেরই পাঁচজন ছেলে ও পাঁচজন মেয়ে তাতে অংশ নিয়েছিল। তাদের মধ্যে আফিয়া ও নিয়াজ সিলেক্ট হয়। ঐদিন বিতর্কের সময় দু'জন দু'জনকে দেখে এবং দু'জনের জ্ঞানের পরিচয় জেনে দু'জনই মুগ্ধ হয়। ডিবেটিং ক্লাস শেষ হওয়ার পর আফিয়া এক ফাঁকে নিয়াজের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে। পরে বান্ধবীদের কাছে তাকে ভার্সিটির সেরা ছাত্র জানতে পারে। ছাত্রী হিসাবে আফিয়াও খুব ভালো। পরীক্ষায় আরও ভালো রেজাল্ট করার জন্য নিয়াজের গত বছরের নোটগুলো নেয়ার মনস্থ করে তার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করল। কিন্তু তাকে পাওয়া খুব মশকিল। ক্লাসের পর সোজা বাসায় চলে যায়। একদিন আফিয়া তাকে লাইব্রেরীতে বসে নোট করতে দেখে কাছে গিয়ে সালাম দিয়ে বলল, আপনাকে বেশ কিছুদিন থেকে খুঁজছি; কিন্তু পাচ্ছিলাম না।

নিয়াজ সালামের উত্তর দিয়ে বলল, আমার সৌভাগ্য। আমার মতো অভাগাকে বেহেশতের হুরের মতো কোনো মেয়ে খুঁজতে পারে, একথা কখনও কল্পনা করি নি। কেন খুঁজছিলেন, তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন। আমার হাতে সময় নেই।

আফিয়া বলল, এত কথা বলে আপনি নিজেই তো সময়টা শেষ করে দিলেন। তাই সংক্ষেপেই বলছি, আপনার গত বছরের নোটগুলো দিতে হবে।

নিয়াজ বেশ অবাক হয়ে বলল, যদি না দিই?

না দিয়ে যাবেন কোথায়?

জোর খাটাবেন? জোরে পারবেন?

দৈহিক জোরে না পারলেও মনের জোরে পারব বলে তার চোখের দিকে তাকিয়ে আফিয়া লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে নিল।

মনে এত জোর পেলেন কি করে?

ডিবেটের দিন আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে।

সব জায়গায় মনের জোর খাটে না, বুঝলেন। চলুন, আর সময় দিতে পারছি না। তারপর বইটা সেলফে রেখে খাতা নিয়ে বেরিয়ে এসে নিয়াজ চলে যেতে লাগল।

আফিয়া তার সাথে আসতে আসতে বলল, কবে দেবেন না বলে চলে যাচ্ছেন যে?

নিয়াজ বলল, আমি তো বলি নি, আপনাকে দেব। কবে দেবার প্রশ্নই উঠতে পারে না। তারপর আফিয়াকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত হেঁটে চলে গেল।

আফিয়া খুব অপমান বোধ করে তার উপর রাগতে গিয়েও পারল না। রাগের বদলে এক ধরনের আনন্দ তার মনে অনুভূত হতে লাগল।

দু'দিন পর ক্লাস শেষে আফিয়া বাসায় ফেরার জন্যে গাড়ির দিকে আসছিল । সে নিজেদের গাড়িতে করে যাতায়াত করে।

নিয়াজ নোট নিয়ে তার জন্যে বারান্দায় অপেক্ষা করছিল। আফিয়াকে যেতে দেখে বলল, শুনুন।

আফিয়া ঘুরে দাঁড়িয়ে নিয়াজকে দেখে তার মনটা আনন্দে উথলে উঠল। সালাম দিয়ে বলল, কেমন আছেন? নিশ্চয় নোটগুলো এনেছেন? দিন বলে হাত বাড়াল।

নিয়াজ আফিয়ার কথা শুনে বেশ অবাক হয়ে চিন্তা করল, তার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর মাত্র একদিন আলাপ হয়েছে। আর আজ দেখা হয়ে যে কথা বলল, তা শুনে নিয়াজ তাকে ঠিক বুঝতে পারল না। তার এক মন বলল, বড়লোকের মেয়েরা একটু বেপরোয়া ধরণের কথাবার্তা বলে। আবার আরেক মন বলল, আফিয়াকে দেখে কিন্তু সে রকম মেয়ে মনে হয় না। তার মুখের দিকে তাকিয়ে সালামের উত্তর দিয়ে বলল, আপনি এসমে আজম জানেন নাকি? যার ফলে আগেভাগে সবকিছু জানতে পারেন।

আফিয়া মৃদু হেসে বলল, এসমে আজম জানলে আপনার কাছে নোট চাইতাম না। পরীক্ষায় খাতায় এসমে আজম পড়ে ফুঁক দিতাম; আর সব প্রশ্নের উত্তর লেখা হয়ে যেত।

এই কথায় দু'জনেই শব্দ না করে হেসে উঠল।

নিয়াজ তার হাতে নোটগুলো দিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি ফেরত দেবেন কিন্তু।

আফিয়া বলল, সে জ্ঞান আমার আছে। আজ ফটোস্ট্যাট করে কালকেই ফেরত দিয়ে দেব।

নিয়াজ বলল, তা হলে আজ চলি। আল্লাহ হাফেজ বলে সালাম বিনিময় করে চলে গেল।

পরের দিন ছুটির পর নোটগুলো ফেরত দেয়ার জন্য আফিয়া নিয়াজের অনেক খোঁজ করল; কিন্তু তাকে কোথাও দেখতে পেল না। গাড়িতে উঠার পরও চারদিকে তাকিয়ে তাকে খুঁজল।

এক সপ্তাহ পরে নিয়াজের দেখা পেয়ে সালাম ও কুশলাদি বিনিময় করার পর আফিয়া নোটগুলো ফেরত দেয়ার সময় বলল, তাড়াতাড়ি ফেরত দিতে বলে এতদিন পাত্তা নেই কেন?

নিয়াজ বলল, সব কথার উত্তর সব সময় দেয়া যায় না। তারপর তার হাত থেকে নোটগুলো নিয়ে চলে গলে।

আফিয়ার মনে হল, নিয়াজ তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে। এরপরও আফিয়া কয়েকবার নিয়াজের কাছ থেকে নোট নিয়েছে এবং ফেরত দিয়েছে। কিন্তু চেষ্টা করেও বেশিক্ষণ আলাপ জমাতে পারে নি। চিন্তা করল, তার সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকতে নিয়াজের এত অনীহা কেন? তা হলে কি এর ভিতর কোনো রহস্য আছে? তবে তার দৃঢ় ধারণা, নিয়াজ তাকেই প্রথম ভালোবেসেছে।

বেশ কিছুদিন পর নিয়াজকে লাইব্রেরীতে নোট করতে দেখে আফিয়া কাছে গিয়ে সালাম দিল।

নিয়াজ মাথা না তুলে সালামের উত্তর দিয়ে নোট করেই চলল।

আফিয়া বলল, মাথাটা দয়া করে তুলুন। একজন এসে সালাম দিল, নিশ্চয় তার কিছু বলার থাকতে পারে।

দেখছেন না নোট করছি।

কথা শোনার পরও নোট করতে পারবেন।

ততক্ষণে নিয়াজের নোট করা শেষ হয়েছে। বইটা যথাস্থানে রেখে খাতাটা নিয়ে বলল, চলুন, যেতে যেতে আপনার কথা শুনব। বাইরে এসে বলল, বলুন কি বলবেন?

আমাকে এড়িয়ে চলছেন কেন?

কবে আবার মেলামেশা করলাম? এড়িয়ে চলার কথা বলছেন যে?

বাইরে না করলেও মনে মনে তো করেছেন।

আমার মনের খবর আপনি জানেন কেমন করে?

যেমন করে আপনি আমার মনের খবর জানেন।

আমি আপনার মনের খবর জানি, একথা আপনাকে কে বলেছে?

আমার মন।

কি বলেছে?

আমার মতো আপনিও আমাকে ভালোবাসেন।

ভালোবাসা কি গাছের পাকা ফল নাকি? দেখে খেতে ইচ্ছে করল আর পেড়ে খেয়ে ফেললাম!

না, তা নয়। কিন্তু এটা কি জিনিস, সেটা আপনিও যেমন জানেন, আমিও তেমনি জানি।

আপনি সাইকোলজি সাবজেক্ট নিলে সাইন করতে পারতেন।

তা হয়ত পারতাম, তবে আপনার কথাতে কিন্তু প্রমান হচ্ছে আমি কারেক্ট।

সত্যকে তো অস্বীকার করতে পারব না। কিন্তু কস্মিনকালেও যা সম্ভব নয়, যাকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে আমার উপর অভিসম্পাত নেমে আসবে তাকে মনে স্থান দেয়াও পাপ।

কেন?

সে কথা আপনার না শোনাই ভালো।

নাই ভালো হোক, তবু শুনব।

আপনি কি জানেন, আমি প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক গ্রামের দুঃখিনী মায়ের এতিম সন্তান? আমার আব্বা রং মিস্ত্রী ছিল? আব্বা মারা যাওয়ার পর আমিও কিছুদিন রাজমিস্ত্রীর জোগালির কাজ করেছি? কিভাবে আমি লেখাপড়া করছি তা আর বললাম না। এরপরও কি আপনি প্রশ্ন করবেন, কেন আপনাকে এড়িয়ে চলি? না আমার উচিত হবে মনের তাগিদে আপনার সঙ্গে মেলামেশা করা?

তারা হাঁটতে হাঁটতে লাইব্রেরীর পিছন দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। আফিয়াকে মাথা নিচু করে থাকতে দেখে নিয়াজ আবার বলল, কি হল? এবার নিশ্চয় আপনার ভুল ভেঙেছে? মনে রাখবেন, স্বপ্ন আর বাস্তব এক জিনিস নয়। স্বপ্নকে স্মৃতির পাতায় এনে কিছুক্ষণ আনন্দ বা সুখ অনুভব করা যায়; কিন্তু তাকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে দুঃখ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। আপনি যা জেনেছেন, তা সত্য। তাকে বাস্তবে রূপ দিতে না গিয়ে সেই দাবীতে আমার কাছ থেকে অন্য যত রকমের সাহায্য চান, তা করব। তবু মনের সেই স্বপ্নের তাজমহলকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে পারব না। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনি বড়লোকের সরল সহজ মেয়ে। যদি আমার কথা বুঝতে না পারেন, তা হলে বয়স্ক কারো কাছে জেনে নেবেন। আজ চলি বলে সালাম দিয়ে চলে যেতে লাগল।

আফিয়া এতক্ষণ নিয়াজের কথা শুনতে শুনতে চোখের পানি গোপন করার জন্য মাথা নিচু করে ছিল। তাকে সালাম দিয়ে চলে যেতে দেখে কান্নাজড়িত স্বরে সালামের উত্তর দিয়ে বলল, প্লীজ যাবেন না। আর একটু দাঁড়ান।

নিয়াজ দাঁড়িয়ে পড়ল।

আফিয়া এগিয়ে এসে ভেজা চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার মতো আমার অত জ্ঞান নেই। তাই আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারলাম না। তবে একটা কথা জেনে রাখুন, আপনি যাই হোন না কেন, আপনার আব্বা যাই ছিলেন না

কেন, আকাশের চন্দ্রসূর্যের মতো চিরকাল আপনাকে আমি ভালোবাসব। চন্দ্রসূর্যের মতো আজীবন আপনি আমার অন্তরের মণিকোঠায় বিদ্যমান থাকবেন। আমি আমৃত্যু তাদের কিরণের ভালোবাসার সাগরে অবগাহন করব। সেখানে আর কারো স্থান হবে না। আমার আর কিছু বলার নেই, এবার আপনি যেতে পারেন। কথা শেষ করে নিয়াজের আগেই সে চলে যেতে লাগল।

দাঁড়ান বলে নিয়াজ তার সামনে এসে পকেট থেকে একটা কবজ বের করে বলল, এটা নেবেন?

আফিয়া কয়েক সেকেন্ড কবজটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আমার ভালোবাসা চটাতে চান বুঝি?

না।

তা হলে?

এটার ভিতরে এমন কিছু কথা লেখা আছে, যা বিপদের সময় খুলে পড়লে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পথ খুঁজে পাবেন।

তা হলে দিন বলে আফিয়া হাত বাড়ল।

এটা নেবার আগে আপনাকে ওয়াদা করতে হবে, শুধু বিপদের সময় ছাড়া কৌতূহলবশত অথবা অন্য কোনো কারণে খুলে পড়বেন না। আর আপনি নিশ্চয় জানেন, আল্লাহপাক কুরান মজিদে বলিয়াছেন, "তিনি ওয়াদা ভঙ্গকারীকে পছন্দ করে না।" এবং আল্লাহপাকের রসুল (দঃ) বলিয়াছেন, "কোনো মুমেনের কাছে তিনটি জিনিস একত্রে থাকে নাঃ মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা ও আমানতের খেয়ানত করা।"

আফিয়া বলল, আল্লাহপাক মেহেরবাণী করে আমাকে ঐ সব জানিয়েছেন।

তা হলে নাও বলে নিয়াজ তার হাতে কবজটা দিয়ে বলল, এটা সব সময় গলায় পরে থাকবে।

বেশ তাই করব বলে আফিয়া চলে গেল।

নিয়াজ কয়েক সেকেণ্ড তার দিকে তাকিয়ে থেকে যখন নিজের পথ ধরল তখন তার চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে উঠল।

ঐদিন বাসায় ফিরে আফিসা আম্মুকে নিয়াজের অভিসম্পাতের কথা জিজ্ঞেস করেছিল।

এইসব কথা সে ঘুমন্ত আম্মুর কাছে বসে বসে চিন্তা করছিল। আম্মুর ডাক শুনে আফিয়া সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখল, সে উঠে বসেছে। জিজ্ঞেস করল, এখন কেমন লাগছে, আম্মু?

বিলকিস বানু বললেন, ভালো। তুই নামায পড়েছিস?

না আম্মু, এখনও পড়িনি।

যা, নামায পড়ে নে।

সে রাতে বিলকিস বানুর চোখে ঘুম এল না। সারারাত হাফিজের কথা ও নিজের অতীত জীবনের কথা মনে পড়তে লাগল।

হাফিজ ও বিলকিসের কথা।

হাফিজ বেশ কিছুদিন জ্বরে ভুগে কয়েক দিন হল ভালো হয়েছে। কিন্তু শরীরে এখনও তেমন শক্তি ফিরে আসেনি। বাসার মধ্যে শুয়ে-বসে থাকতে থাকতে তার মন বিষিয়ে উঠেছে। তাই আজ বিকেলে একটা রিকশায় করে গুলশান সুপার মার্কেটের পার্কে এসে বসে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলা দেখছিল। এক সময় রংপুরের এক অখ্যাত পল্লীগ্রামের কথা তার মনের পর্দায় ভেসে উঠল। সবুজ গাছপালার ছায়াভরা গ্রাম। গ্রামের শেষ প্রান্তে তাদের ছোট্ট দু'কামরা বাড়ি। বাড়িটা ছোট হলেও আঙ্গিনাটা বেশ বড়। তার চারপাশে নানারকম ফলের গাছগাছালি। পাশেই ধানের মাঠ। তাদের গ্রামে জুম্মা মসজিদ নেই। তাই ছোটবেলায় আব্বা যখন ঘরে থাকত তখন পাজামা, পাঞ্জাবী ও মাথায় টুপি পরে আব্বার হাত ধরে মাঠের আলের উপর দিয়ে পাশের গ্রামের মসজিদে জুম্মার নামায পড়তে যেত। বর্ষাকালে মাঠের সবুজ ধানগাছগুলো যখন বাতাসে ঢেউ খেলত তখন তার কচি মনেও আনন্দের ঢেউ খেলত। আব্বা যখন ঘরে থাকত না তখন আম্মা তাকে অত দূরের মসজিদে একা নামায পড়তে যেতে দিত না। কান্নাকাটি করেও যাওয়ার অনুমতি পেত না। তারপর একটু বড় হলে আম্মা আর আপত্তি করত না। আমের দিনে দুপুরবেলা আম্মা ঘুমিয়ে পড়লে ভাঁড়ার ঘর থেকে সরষের তেল, লবণ ও মরিচগুঁড়ো চুরি করে পাড়ার ছেলেদের সাথে আম পেড়ে চাটনি করে খেত। এইসব ভাবতে ভাবতে তার ছোট বোন সায়রার চিঠির কথা মনে পড়ল। জ্বরে পড়ার তিন দিন আগে তার চিঠি পেয়েছে। তাতে লিখেছে–

ভাইয়া,

পত্রে আমার সালাম নিও। আশা করি, আল্লাহর রহমতে ভালো আছ। এখানকার খবর খুব খারাপ। আম্মার শরীর ভালো নয়। টাকার জন্য ডাক্তার দেখাতে পারছি না। আমার স্কুলের চার মাসের বেতন বাকি পড়েছে। বেতন ও পরীক্ষার ফী না দিলে পরীক্ষা দিতে দেবে না। পত্র পাওয়া মাত্র কমপক্ষে পাঁচশ টাকা পাঠাবে। তুমি কি এখনও কোনো চাকরি পাওনি? তুমি যে টাকা পাঠাও, তাতে সংসারই চলে না। আমার পড়ার খরচ ও অন্যান্য খরচ কিভাবে চলছে, তা কি একটুও ভেবে দেখ না। যদি সম্ভব হয় দু'একদিনের জন্য হলেও বাড়িতে এসে আম্মাকে ডাক্তার দেখিয়ে যাও। আর যদি

আসতে না পার তবে টাকাটা অবশ্যই পাঠাবে। বিশেষ আর কি লিখব, আম্মা তোমাকে দো'য়া বলে দিয়েছে। তোমার পত্রের ও টাকার অপেক্ষায় রইলাম। আল্লাহ হাফেজ।

ইতি–

তোমার আদারের বোন

সায়রা।

হাফিজ যখন চিঠিটা পায় তখন মাসের পচিঁশ তারিখ। তার কাছে মাত্র একশ টাকা ছিল। প্রায় পনের দিন একটা বাড়ি কনট্রাক্ট নিয়ে রং-এর কাজ করেছে। সেখানে বেশ কিছু টাকা তার পাওনা ছিল। ক'দিন ধরে শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিল বলে কাজটা শেষ করতে পারে নি। চিঠি পেয়ে হাফিজ তার কাছে গিয়ে টাকা চাইল।

বাড়িওয়ালা বলল, বাকি কাজ কমপ্লিট না করলে টাকা দেয়া হবে না।

হাফিজ শরীর খারাপের কথা বলে বলল, কয়েকদিনের মধ্যে আপনার বাড়ির কাজ করে দেব। এখন টাকাটা আমার খুব দরকার। যদি দিতেন, তা হলে ভীষণ উপকার হত।

বাড়িওয়ালা রেগে গিয়ে বলল, আমি এক কথার মানুষ। কাজ শেষ করে আপনি সব টাকা নিয়ে যাবেন।

হাফিজ আরও দু'একবার অনুরোধ করে বিফল হয়ে ফিরে এল। শেষে চাচাতো ভাই মোসলেমের কাছ থেকে দু'শো টাকা হাওলাত নিয়ে মোট তিনশ টাকা মানি অর্ডার করে পাঠিয়েছে। টাকা পাঠাবার দু'দিন পর বিলকিসের চিঠি পায় এবং সেই রাত থেকে সে জ্বরে পড়ে। চিঠি পড়ে চিন্তা করেছে ইশিতাকে আর পড়াতে যাবে না। এই সব চিন্তা করতে গিয়ে আবার দেশের বাড়ির কথা মনে পড়ল। আম্মার চিকিৎসা হল কিনা? সায়রা পরীক্ষা দিল কিনা? আম্মা এখন কেমন আছে? তারপর নিজের ভাগ্যের কথা চিন্তা করতে করতে ছেলেবেলা থেকে একের পর এক সব কথা মনের পাতায় ভেসে উঠল। তার আব্বা রংমিস্ত্রী ছিল। দেশের শহরে-বন্দরে বেশিরভাগ সময় থেকে রং-এর কাজ করত। দু'তিন মাস পর যখন বাড়ি যেত তখন অনেক টাকা আম্মার হাতে দিয়ে বলত, হাফিজের মা, আমি তো দু'চার দিনের জন্য তোমাদেরকে দেখতে এসেছি। টাকাগুলো গুছিয়ে রাখ। খুব বুঝে বুঝে খরচ করো। আল্লাহপাক আবার কবে তোমাদের কাছে নিয়ে আসবেন তা তিনিই জানেন। হাফিজের মা সবুরাও রংমিস্ত্রির মেয়ে। সবুরাব বাবা জলিলের কাছে তার বাবা নাসের প্রথমে জোগালির কাজ করত। নাসের দেখত শুনতে যেমন খুব ভালো ছিল তেমনি সৎ ও ধার্মিক ছিল। এক ওয়াক্ত নামায কাযা করত না। জলিল নিজে নামায না পড়লেও নাসেরকে ঠিকমতো নামায পড়তে দেখে এবং তার কাজকর্ম দেখে খুব স্নেহ করত। তাই তার কাজ শেখার ঝোঁক দেখে তাকে কিছুদিনের মধ্যে কাজ শিখিয়ে রংমিস্ত্রী করে দেয়। রংমিস্ত্রী হওয়ার পর নাসের জলিলের কাছে কাজ করতে থাকে। নাসেরের আচার-ব্যবহার ও সুন্দর স্বাস্থ্য দেখে জলিল তার একমাত্র মেয়ে সবুরার সঙ্গে বিয়ে দেয়। তারপর শ্বশুর-জামাই একসঙ্গে বহুদিন কাজ করে। বিয়ে হওয়ার তিন বছর পর হাফিজের জন্ম হয়। হাফিজ

জন্মাবার চার বছর পর হান্নান জন্মায়। হান্নানের বয়স যখন তিন বছর তখন সে পুকুরে ডুবে মারা যায়। তার তিন বছর পর সায়রা জন্মায়। তারপর তাদের আর ছেলেপুলে হয়নি। নাসেরের খুব ইচ্ছা ছিল ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া করিয়ে বড় করবে। তাই যথাসময়ে তাদেরকে প্রথমে গ্রামের মক্তবে এবং পরে স্কুলে ভর্তি করে দেয়। সে মোটামুটি ভালো রোজগার করত। ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার পিছনে খরচ করতে কৃপণতা করত না। হাফিজ ও সায়রা খুব ভালো ছাত্র-ছাত্রী না হলেও প্রতি বছর ভালভাবে পাস করে উপরের ক্লাসে উঠে। হাফিজ যে বছর এস.এস.সি পাস করে কলেজে ভর্তি হল, সে বছর নাসের ঢাকায় মতিঝিলে দশতলা বাড়ি রং করার সময় প্রচণ্ড রোদের গরমে মাথাঘুরে নিচে পড়ে গিয়ে মারা যায়। তার লাশ তিনচার খণ্ড হয়ে গিয়েছিল। শ্বশুর জলিলও তার সঙ্গে কাজ করছিল। জামাইয়ের অবস্থা দেখে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। পরে জলিল জামাইয়ের লাশ ছালায় ভরে দেশের বাড়িতে নিয়ে এসে দাফন-কাফন করে। স্বামীর খবর শুনে ও লাশ দেখে সবুরার মাথা অনেক দিন খারাপ হয়ে ছিল। পরে আস্তে আস্তে ভালো হয়ে যায়। কিন্তু এখনও সে প্রতি রাতে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসায়। জামাইয়ের মৃত্যুর পর জলিল রংমিস্ত্রির কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে কৃষিকাজ করে দিন গুজরান করতে লাগল। দেশের অনেকে বলল, একটু তদবীর করলে নাসেরের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে। জলিল তাদেরকে বলেছে, টাকা নিয়ে কি করব? জামাইকে তো আর ফিরে পাব না। জামাইয়ের লাশের বদলে টাকা নিতে পারব না।

এদিকে সবুরা ছেলেমেয়ে নিয়ে দুঃখের সঙ্গে দিন কাটাতে লাগল। স্বামীর অল্পকিছু জমি-জায়গা থাকলেও তাতে তাদের ছ'মাসের খোরাকি হয় না। তার উপর দুটো ছেলেমেয়ের পড়ার খরচ।

আব্বা মারা যাওয়ার পর সংসারের অভাব-অনটন দেখে হাফিজ একদিন মাকে বলল, আমার আর পড়াশুনা হবে কি করে। তার চেয়ে আমি কিছু রোজগারের চেষ্টা করি।

সুবরা চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, তোকে আমি ভিক্ষে করে হলেও পড়াব। তোর আব্বা প্রায়ই বলত, "হাফিজকে লেখাপড়া করিয়ে অনেক বড় করব। কোনো কারণেই যেন হাজিফ লেখাপড়া বন্ধ না করে। ওকে বি.এ, এম.এ পর্যন্ত পড়িয়ে মানুষের মতো মানুষ করব।" তুই লেখাপড়া বন্ধ করিস না বাবা। তোর আব্বার ইচ্ছা আমি যেমন করে হোক পূরণ করব। জলিল প্রায়ই মেয়ের বাড়িতে খোঁজখবর নিতে আসত। তাদের বাড়ি মাইল পাঁচেক দূরে। একদিন সে এলে সবুরা আব্বাকে বলল, হাফিজ লেখাপড়া বন্ধ করে কিছু একটা করতে চাচ্ছে। তারপর স্বামীর ইচ্ছার কথা জানিয়ে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, আমি ওকে যেমন করে হোক লেখাপড়া করাতে চাই।

জলিল বলল, তুই কাঁদিস না মা। আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন হাফিজ দাদুর পড়াশোনার খরচ চালিয়ে যাব। তারপর নাতিকে ডেকে বলল, দাদু, তুমি পড়াশোনা বন্ধ করো না। তোমার আব্বাকে আল্লাহপাক দুনিয়া থেকে তুলে নিয়েছে তো কি হয়েছে, আমি তোমার পড়াশোনার সব খরচ দেব। তুমি মন দিয়ে পড়াশোনা কর।

সংসারের চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। আল্লাহপাক একভাবে না একভাবে চালিয়ে নিবে। তুমি প্রত্যেক ওয়াক্তে নামাযের পর তাঁর দরবারে সাহায্য চাইবে। তিনি সব কিছুর মালিক। তাঁর ঈশারাতেই সবকিছু চলছে। জামাইয়ের মৃত্যুর পর জলিল নামায পড়তে শুরু করার সাথে সাথে ধর্মের সবকিছু মেনে চলছে। সে যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন নাতি-নাতনির পড়াশোনার খরচ চালিয়েছে। বছর দু'য়েকের মধ্যে জলিল হঠাৎ একদিন মারা গেল। সেদিন হাফিজের ফাইনাল পরীক্ষার শেষ দিন। পরীক্ষা দিয়ে এসে নানা মারা যাওয়ার খবর পেয়ে মা ও বোনকে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে নানাদের বাড়ি গেল। সেখানে কয়েকদিন থেকে নানিকে সঙ্গে করে সবাইকে নিয়ে ফিরে এল।

হাফিজের নানি মুর্শিদা খুব বুদ্ধিমতি মহিলা। স্বামীর ভিটে-মাটি ও অল্পস্বল্প যা জমি-জায়গা ছিল, তা বিক্রি করে নাতি-নাতনির লেখাপড়া করার জন্য সব টাকা মেয়ের হাতে তুলে দিল।

হাফিজ কারমাইকেল কলেজ থেকে ভালভাবে বি.এ পাস করে আরও পড়াশোনা ও চাকরির চেষ্টায় ঢাকায় এল। তাদের গ্রামের দূর-সম্পর্কের এক চাচাতো ভাই মোসলেম মহাখালি যক্ষ্মা হাসপাতালের ওয়ার্ড মাস্টার। সে হাসপাতাল এরিয়ার মধ্যে সরকারী কোয়ার্টারে ফ্যামিলি নিয়ে থাকে। হাফিজ কিছু টাকা-পয়সা সঙ্গে করে নিয়ে এসে তাদের বাসায় পেয়িংগেস্ট হিসাবে থেকে চাকরির চেষ্টা করতে লাগল। আর ভাবল, একটা-কিছু করতে পারলে এম.এ পড়বে। আজ প্রায় দু'বছর হতে চলল সে এখানে আছে। তার স্বপ্ন আর সফল হয়নি। বহু চেষ্টা করেও সামান্য একটা পিয়নের চাকরিও জোগাড় করতে পারেনি। ঢাকায় আসার এক বছর পর তার নানি মারা যায়। নানি মারা যাওয়ার তিন দিন পর দেশের একটা লোকের মুখে খবর পেয়ে বাড়িতে যায়। গত এক বছরের মধ্যে সে আর বাড়িতে যায়নি। এবারে গিয়ে কয়েকদিন থেকে ঢাকায় ফিরে এসেছে।

প্রথম যখন হাফিজ ঢাকায় আসে তখন কয়েক মাস যে কোনো একটা চাকরির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। শেষে কোনো উপায় না দেখে রংমিস্ত্রির জোগালির কাজ শুরু করে। নিজের খাওয়া-খরচ রেখে মাসে অল্পকিছু টাকা দেশে পাঠাত। তার শরীরে রংমিস্ত্রির রক্ত ছিল। তাই সে খুব তাড়াতাড়ি রংমিস্ত্রি হয়ে যায়। রংমিস্ত্রি হওয়ার পর বেশি করে টাকা পাঠায়। কিন্তু যখন কাজ বন্ধ থাকে তখন টাকা পাঠাতে পারে না। এভাবে আজ দু'বছর হতে চলল ঢাকাতে রয়েছে। এখন আর চাকরির জন্য তেমন সময় নষ্ট করে না। তবে প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়ার সময় চাকরির বিজ্ঞপ্তি দেখে মনের মতো কিছু পেলে মাঝে মাঝে অ্যাপ্লিকেশান করে। কোথাও থেকে ইন্টারভিউ কার্ড এলে ইন্টারভিউ দেয়। কিন্তু কোনো ফল হয় না।

এইসব চিন্তা করতে করতে ইশিতার 'স্যার' ডাক শুনে চিন্তাটা থমকে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে চাইতে ইশিতা বলল, স্যার আপনি এখানে? এতদিন পড়াতে যাননি কেন? আপনি অনেক রোগা হয়ে গেছেন। আপনার কি অসুখ করেছিল?

হাফিজ সালাম দিয়ে বলল, হ্যাঁ, বেশ কিছুদিন জ্বরে ভুগেছি। তাই পড়াতে যেতে পারিনি।

হাফিজ সালাম দিতে ইশিতা খুব লজ্জা পেল। কারণ হাফিজ যেদিন তাকে প্রথম পড়াতে যায় সেদিন সালাম দেয়ার কারন ও ফজিলত বুঝিয়ে বলেছিল। পরের দিন থেকে সে হাফিজ পড়াতে এলে এবং পড়িয়ে চলে যাওয়ার সময় সালাম দিতে শুরু করে। আজ তার সে কথা মনে ছিল না। তাই লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে সালামের উত্তর দিয়ে বলল, এখন কেমন আছেন?

হাফিজ বলল, জ্বর সেরেছে। কিন্তু শরীরে শক্তি ফিরে আসেনি।

ইশিতা বলল, আজ আমাদের বাসায় আসতে পারবেন না স্যার? সন্ধ্যের পর আমার জন্মদিন পালন করা হবে। আপনাকে নিমন্ত্রন করার জন্য বাবা ও আপা আমাকে আপনার ঠিকানা জিজ্ঞেস করেছিল। আমি জানি না বলে বলতে পারিনি। আমার সঙ্গে চলুন না স্যার, গাড়ি আছে।

হাফিজ বলল, আজ যেতে পারব না, তুমি যাও। মাগরিবের নামাযের সময় হয়ে এল। আমি মসজিদে নামায পড়তে যাচ্ছি বলে সালাম জানিয়ে চলে গেল।

ইশিতা সালামের উত্তর দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। চোখের আড়াল হয়ে যেতে সে গাড়ির কাছে এসে ড্রাইভারকে বলল, চলুন চাচা, অনেক দেরি হয়ে গেল, মা বকবে।

ইশিতারা দু'বোন এক ভাই। ভাই সকলের বড়। নাম হাসান। এম.এ পাস করে বাবার সঙ্গে বিজনেস দেখাশুনা করে। এখনও বিয়ে করেনি। দু'বোনের মধ্যে ইশিতা ছোট। এ বছর ক্লাস টেনে উঠেছে। বড় বোনের নাম বিলকিস। সে বি.এ পড়ছে। এটা তার ফাইন্যাল ইয়ার। দু'বোনই অপরূপা। যেমন রং তেমনি নিখুত দেহের গড়ন। তবে বিলকিস যৌবনে পা দিয়েছে বলে ইশিতার চেয়ে তাকে বেশি সুন্দরী বলে মনে হয়। বিলকিস একটু ধীর ও নম্র প্রকৃতির মেয়ে। আর ইশিতা বেশ চটপটে ও বাকপটু। তাদের বাবা রকিব সাহেব বিজনেস ম্যান। একটু গম্ভীর ধরণের লোক হলেও একবার কথা বলতে শুরু করলে অনেক কথা বলেন। দেশের বাড়ি পাবনা। গুলশানে জায়গা কিনে বাড়ি করেছেন। ইশিতা নিচের ক্লাস থেকে বরাবর অংক ও ইংরেজিতে কাঁচা। সেই জন্য রকিব সাহেব সব সময় প্রাইভেট মাস্টার রেখেছেন। কিন্তু ইশিতার অংক ও ইংরেজি কঠিন লাগত বলে ঐ সাবজেক্ট দু'টোর জন্যে প্রাইভেট মাস্টার থাকা সত্ত্বেও বিশেষ উন্নতি করতে পারেনি। কোনো রকমে পাস মার্ক পেয়ে ক্লাস নাইন পর্যন্ত উঠে এসেছে। রকিব সাহেব নিজের বিজনেস নিয়ে মেতে থাকেন। ছোট মেয়ের জন্যে মাস্টার রেখে নিশ্চিন্ত। ছেলে হাসান ও বড় মেয়ে বিলকিসের মাথা ভালো; তাদের কোনো মাস্টারের দরকার হয়নি। ইশিতা যখন নাইনে উঠল তখন রকিব সাহেব তার অংক ও ইংরেজির নাম্বার দেখে খুব অসন্তুষ্ট হলেন। সে সবার ছোট বলে তাকে একটু বেশি স্নেহ করেন। তাই মৃদু তিরস্কার করে বললেন, কই, তোর ভাইয়া ও আপার জন্য তো কোনো দিন মাস্টারের দরকার হয়নি। তবু তাদের রেজাল্ট কত ভালো। আসলে তুই ঐ দু'টো সাবজেক্টে ফাঁকি দিস।

ইশিতা বলল, সকলের মাথা কি সমান হয়? তা ছাড়া তুমি যে মাস্টার রেখেছ, তিনি ভালোভাবে পড়াতে পারেন না।

রকিব সাহেব বললেন, ঠিক আছে, এই মাস্টারকে বাদ দিয়ে অন্য একজন ভালো মাস্টারের ব্যবস্থা করছি। দেখব, এবার রেজাল্ট কেমন হয়। তারপর আগের মাস্টারকে বিদায় করে ভালো মাস্টারের খোঁজ করতে থাকেন।

বিলকিস ইশিতাকে ঘন্টাখানেক অংক ও ইংরেজি বুঝিয়ে দেয়। একদিন তাকে ইংরেজী পড়াটা বুঝিয়ে দিয়ে কি একটা দরকারে অন্য রুমে গেল। ইশিতা রিডিং পড়ার সময় অনেক শব্দের ভুল উচ্চারণ করছিল। পাশের রুমে হাফিজ কাজ করছিল। সে কয়েকদিন আগে থেকে দু'তিন জন মিস্ত্রি ও জোগালি নিয়ে এদের বাড়ি রং করছে। বাইরের কাজ শেষ করে গতকাল থেকে রুমের ভিতরে ডিস্টাম্বার করছে। সে রকিব সাহেবের সঙ্গে কথা বলে পুরো বাড়িটা রং করার কন্ট্রাক্ট নিয়েছে। এই ক'দিনে তাদের বাসায় সকলের সঙ্গে হাফিজ বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছে। হাফিজের সুন্দর স্বাস্থ্য ও আচার-ব্যবহারে তারা তাকে ভদ্রঘরের শিক্ষিত ছেলে বলে মনে করেছে। ভেবেছে অভাবে অথবা অন্য কোনো কারণে হয়ত এই কাজ করছে। তবে হাফিজ যে বি.এ পাস তা তারা জানত না। সবাই তার সঙ্গে ফ্রিভাবে কথা বলে। তাই ইশিতাকে বারবার ভুল উচ্চারণ করে পড়তে শুনে হাফিজ থাকতে পারল না। তার রুমে এসে বলল, ছোট আপাকে একটা কথা বলব কিছু মনে করবেন না তো?

ইশিতা বলল, কি বলবেন বলুন, কিছু মনে করব না।

হাফিজ বলল, আপনি অনেক ভুল উচ্চারণ করে পড়ছেন। আমি কি আপনাকে একটু সাহায্য করতে পারি?

ইশিতা খুব অবাক হয়ে বলল, আপনি শিক্ষিত?

হাফিজ মৃদু হেসে বলল, শিক্ষিত না হলেও অল্পস্বল্প লেখাপড়া করেছি। ততক্ষণে বিলকিস কাজ সেরে ফিরে এসে ঘরে ঢুকতে গিয়ে রংমিস্ত্রি হাফিজের কথা শুনতে পেয়ে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রথম যেদিন আব্বার সঙ্গে তাকে আসতে দেখে এবং পুরো বাড়িটা ঘুরে এসে ড্রইংরুমে বসে চা খাওয়ার সময় যখন রং করার ব্যাপারে কথাবার্তা বলে তখন বিলকিস তার সুন্দর চেহারা ও মার্জিত কথাবার্তা শুনে খুব মুগ্ধ হয়। এত সুন্দর হ্যাণ্ডসাম ছেলে রংমিস্ত্রি জেনে কথাটা সে বিশ্বাস করতে পারেনি। তাকে যেন অনেক দিনের পরিচিত ছেলে বলে তার মনে হল। কোথায় দেখেছে এবং সে কেমন পরিচিত চিন্তা করার সময় তার মনের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল, একে তুমি আগে কখনও দেখনি। এর সঙ্গে তোমার কোনো পরিচয়ও হয়নি। এই রকম ছেলেকে তুমি জীবনসাথী করার জন্য মনে মনে কামনা করে এসেছ। তাই পরিচিত বলে তোমার মনে হচ্ছে। তারপর আব্বা যখন বাসার সবাইকে ডেকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, আমি ও হাসান অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকি। এই মিস্ত্রি যখন যা চাইবে তা দেয়ার ব্যবস্থা করো। সেই সময় বিলকিস বারবার হাফিজের দিকে তাকিয়ে দেখেছে আর সমস্ত শরীর ও মনে এক অজানা শিহরণ অনুভব করেছে। হাফিজের কথামতো রকিব সাহেব তাকে সঙ্গে করে গুলশান মার্কেট থেকে প্রয়োজনীয় সবকিছু একবারে কিনে দিয়েছেন। ফলে বাসার কারো কাছে কিছু চাওয়ার দরকার হাফিজের হয়নি। তবু বিলকিস ইশিতাকে সাথে করে মাঝে মাঝে হাফিজের কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, কোনো কিছু দরকার আছে কি না।

ঐদিন রকিব সাহেব যখন সকলের সঙ্গে হাফিজের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন তখন বিলকিসের দিকে তাকাতে গিয়ে চোখে চোখ পড়ে যায়। সেই সময় বিলকিসের চোখের দৃষ্টিতে যা দেখেছিল, সে কথা মনে হলে এখনও হাফিজ চমকে উঠে। ভেবেছিল, কোনো অপরিচিত মেয়ে কি এরকম দৃষ্টিতে কোনো অপরিচিত ছেলের দিকে তাকাতে পারে? তখন তারও মনে হয়েছিল মেয়েটা যেন কতকালের চেনা। তারপর সে নিজের পরিচয়ের কথা চিন্তা করে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে। আজ ইশিতাকে ভুল পড়তে শুনে নিজের পরিচয়ের কথা ভুলে গিয়ে তার রুমে এসে ঐ কথা বলল।

হাফিজের কথা শুনে ইশিতা বলল, আপনি তা হলে শুদ্ধ করে পড়িয়ে দিন।

হাফিজ তাকে কয়েকবার রিডিং পড়িয়ে তার অর্থ বুঝিয়ে বড় বড় শব্দগুলোকে কিভাবে বানান করে শুদ্ধ উচ্চারণ করা যায় তা বলে দিয়ে চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল।

বিলকিস এতক্ষণ দরজার আড়াল থেকে হাফিজের পড়াবার কায়দা ও শুদ্ধ উচ্চারণ শুনে বুঝতে পারল সে শিক্ষিত। তাকে উঠতে দেখে ভিতরে এসে বলল, যাবেন না, বসুন। তারপর ইশিতাকে বলল, তুই বুয়াকে চা করে নিয়ে আসতে বলে কিছু নাশতা নিয়ে আয়।

হাফিজ বলল, না না, ওসব কিছু লাগবে না। আমি কাজ ফেলে এসেছি, যাই। প্রতিদিন তো কয়েকবার করে আপনারা চা খাওয়াচ্ছেন।

বিলকিস বলল, সেটা মিস্ত্রি হিসাবে খাচ্ছেন। এখন যা খাবেন তা শিক্ষক হিসাবে। তারপর ইশিতাকে বলল, যা, তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়।

ইশিতা চলে যাওয়ার পর হাফিজকে জিজ্ঞেস করল, আপনি নিশ্চয় শিক্ষিত?

হাফিজ মৃদু হেসে বলল, শিক্ষিত না হলেও ছোট আপার পড়া বলে দেয়ার মতো লেখাপড়া করেছি।

কোয়ালিফিকেশানটা বলুন?

সব ক্ষেত্রে সব কিছু বলা ঠিক নয়।

আমার প্রশ্নের উত্তর বলাটা কি বেঠিক হবে?

না তা নয়, তবে আমার পক্ষে একটু অসুবিধে আছে বলে বলতে পারলাম না। সে জন্যে দুঃখিত।

এই কাজ কতদিন করছেন?

তা প্রায় এক বছরের বেশি হয়ে গেছে।

কোনো চাকরির চেষ্টা করেননি কেন?

করে বিফল হয়েছি।

দেশ কোথায়?

রংপুর।

বাড়িতে কে কে আছে?

মা আর এক বোন।

বোনটা কতবড়?

ক্লাস এইটে পড়ে।

এমন সময় ইশিতা নাশতা নিয়ে ঢুকল। বিলকিস পরিবেশন করে বলল, নিন খান।

হাফিজ বলল, তা কি করে হয়, আমি একা খাব নাকি? নাশতার মধ্যে ছিল কয়েক ফালি আপেল ও পেঁপে। বিলকিস তা থেকে এক ফালি আপেল ইশিতাকে দিয়ে নিজেও এক ফালি নিল। একটু পরে আয়া তিন কাপ চা নিয়ে এল।

পরের দিন বিলকিস ইশিতার একটা অংকের উত্তর কিছুতেই মেলাতে পারছিল না।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও আপা অংকটা পারছে না দেখে ইশিতা বলল, হাফিজ মিস্ত্রিকে ডাকব আপা? সে হয়ত অংকটা করে দিতে পারবে।

বিলকিস ভাবল কথাটা মন্দ নয়, অংকটা করতে পারলে বোঝা যাবে কতটা শিক্ষিত। বলল, তাই ডেকে নিয়ে আয় দেখি।

হাফিজ তখন ভারায় কাজ করছিল। ইশিতা তার কাছে গিয়ে বলল, আপা আপনাকে ডাকছে।

হাফিজ বলল, আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি আসছি। তারপর ভারা থেকে নেমে হাত ধুয়ে বলল, চলুন।

ইশিতা তাকে পড়ার রুমে নিয়ে এল।

হাফিজ রুমে ঢুকে বিলকিসকে সালাম দেয়ার সময় চোখে চোখ পড়ে গেল। বিলকিসের দৃষ্টি তার কলজে কাঁপিয়ে দেয়। সেই প্রথম দিনের চোখাচোখি হওয়ার পর থেকে হাফিজ বড় একটা তার মুখের দিকে তাকায় না। মাঝে মাঝে ইশিতাকে সঙ্গে করে এসে সে যখন কোনো কিছু প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞেস করে তখন হাফিজ তার দিকে না তাকিয়ে ইশিতার দিকে তাকিয়ে কথা বলে। আজ চোখে চোখ পড়তে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য সে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। তারপর সামলে নিয়ে দৃষ্টি নত করে বলল, কেন ডেকেছেন বলুন।

হাফিজকে দেখলে বিলকিসের মনের মধ্যে আনন্দের লহরী বইতে শুরু করে। তাকে একপলক দেখার জন্য তার মন ছটফট করে। সে সামান্য রংমিস্ত্রি জেনেও মনকে বশে রাখতে পারে না। তাই হাফিজ যখন কাজ করে তখন সবার অলক্ষ্যে তাকে দেখে। আজ ইশিতা তাকে অংক করার জন্য ডাকার কথা বলতে আনন্দে তার মনটা দুলকে উঠে। ইশিতা ডাকতে চলে যাওয়ার পর থেকে দরজার দিকে তাকিয়ে ছিল। হাফিজকে দৃষ্টি নত করে কথা বলতে দেখে বিলকিস সালামের উত্তর দিয়ে বসতে বলল। হাফিজ বসার পর বিলকিস খাতা, কলম ও অংকের বইটা তার সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল, ইশিতার এই অংকটা ঠিক নিয়মে করছি অথচ উত্তর মিলছে না। আপনি যদি অংকটা করে দিতেন– বলে থেমে গেল।

হাফিজ অংকটা দু'বার পড়ে অল্পক্ষণের মধ্যে করে উত্তর মিলিয়ে বুঝিয়ে দিল। ইশিতা বলল, আপনি তো অংকে দারুণ। আপা সেই কখন থেকে উত্তর মেলাতে পারছিল না। আমাকে পড়াবেন। গতকাল ইংরেজী পড়াটাও কত সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন।

হাফিজ বিলকিসের দিকে তাকিয়ে দেখল, সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বলল, তা কি করে হয়! ছেলেবেলা থেকে আমি অংক ইংরেজীতে একটু ভালো। তাই বলে আপনাকে পড়াবার যোগ্যতা আমার নেই।

বিলকিস বলল, যোগ্যতার বিচার আমরা করব। আপনি পড়াবেন কিনা বলুন?

হাফিজ বলল, ভেবেচিন্তে জানাব। এখন যাই, কাজ ফেলে রেখে এসেছি।

ঐদিন রাতে খাবার টেবিলে বিলকিস আব্বাকে বলল, তুমি ইশিতার মাষ্টার রাখার কত দূর কি করলে?

রকিব সাহেব বললেন, খোঁজে আছি। পেলে ব্যবস্থা করব।

বিলকিস বলল, হাফিজ নামে যে ছেলেটা আমাদের বাড়ি রং করছে সে মনে হয় শিক্ষিত।

হাফিজ যে লেখাপড়া করেছে রকিব সাহেব প্রথম দিন তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝতে পেরেছিলেন। বললেন, হয়ত হবে। তার কথা বলছিস কেন?

বিলকিস গত দু'দিনের ঘটনা বলে বলল, আমার মনে ছেলেটা শুধু শিক্ষিত নয়, বেশ ভালো শিক্ষিত। আর ইশিতা তার কাছে পড়তে চায়।

আব্বা কিছু বলার আগে হাসান বলল, সে শিক্ষিত হতে পারে, তাই বলে তাকে ইশিতার মাষ্টার হিসাবে রাখতে পারি না। লোকে কি বলবে?

বিলকিস বলল, সেটা তোমরা যা বুঝবে করবে। ইশিতা বলছিল, হাফিজ খুব ভালো পড়ায়। সে তার কাছে পড়তে চায়। তাই বললাম। তবে আমি মনে করি মানুষ জীবিকা অর্জনের জন্য অন্যায় কিছু ছাড়া যে কোনো কাজ করতে পারে। কোনো পেশাকেই ছোট মনে করা উচিত না। বিদেশে বহু উচ্চশিক্ষিত লোক কোনো কাজকেই ছোট মনে করে না।

হাসান বলল, তোর কথা অস্বীকার করছি না। তবে তুই যে বিদেশের কথা বললি, সেখানকার মানুষের মন-মানসিকা কত উন্নত। আর আমাদের দেশের মানুষের কথা তুই তো জানিস।

রকিব সাহেব বললেন, আমরা বিদেশীদের অনেক কিছু অনুকরণ করে সভ্যতার বিকাশ ঘটাচ্ছি। কিন্তু তাদের এই মনমানসিকতার অনুকরণ না করে আমাদের দেশে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। প্রেসটিজের কথা চিন্তা করে ছোটখাট কোনো কাজ করতে না পেরে হীনমন্যতায় ভুগছে। অনেকে বেকারত্বের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে চরিত্র হারাচ্ছে। অসৎ উপায়ে টাকা উপার্জন করছে। আবার অনেকে মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে। যতদিন আমাদের দেশের শিক্ষিত ছেলেদের মনমানসিকতার এই হীন প্রবৃত্তির পরিবর্তন না হবে এবং সরকারও যদি বেকার সমস্যা সমাধানের জন্যে কিছু না করে, তা হলে দেশের যুবকদের আরওঅবনতি ঘটবে।

বিলকিস বলল, বাবা, আমি তোমার সঙ্গে একমত ।

রবিক সাহেব বললেন, ইশিতা যে হাফিজের কাছে পড়তে চাইছে, হাফিজ কি পড়াবে?

বিলকিস বলল, তুমি তাকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখতে পার।

রকিব সাহেব বললেন, ঠিক আছে, দেখি তাকে বলে।

হাসান এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার বলল, এটা আমি ঠিক মেনে নিতে পারছি না। খুব দৃষ্টিকটু দেখাবে। তা ছাড়া আমাদের সোসাইটির একটা প্রেসটিজ আছে।

রকিব সাহেব বললেন, তা আছে। তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রেসটিজ বিচার করা উচিত নয়। যে জ্ঞানী ও সৎ, সে যেই শ্রেণীর লোক হোক না কেন তার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে কারো দ্বিধা থাকা ঠিক নয়।

হাসান আর কিছু না বলে উঠে নিজের রুমে চলে গেল।

পরের দিন বিকেলে রকিব সাহেব চা খাওয়ার সময় হাফিজকে ডেকে বললেন, কাজ শেষ হতে আর কত দিন লাগবে?

হাফিজ বলল, ইনশাআল্লাহ এক সপ্তাহের মধ্যে শেষ করতে পারব বলে আশা রাখি। আপনি যা সৌখিন লোক, নচেৎ যেমন-তেমন মিস্ত্রি দিয়ে কাজ করালে এতদিন শেষ হয়ে যেত। আজকাল ভালো মিস্ত্রি পাওয়া খুব মুশকিল।

রকিব সাহেব বললেন, আপনি নাকি আমার ছোট মেয়ে ইশিতার ইংরেজী পড়া ও অংক করে দিয়েছিলেন? সে তো আপনার কাছে পড়তে চায়। আমিও তার জন্যে একজন মাস্টারের খোঁজ করছিলাম। আপনি কি তাকে পড়াবেন?

হাফিক কয়েক সেকেণ্ড মাথা নিচু করে ভেবে বলল, দেখুন, সেটা কি ঠিক হবে? আমি একজন রংমিস্ত্রি, আপনার মেয়েকে পড়াতে এলে আপনাদের সম্মানের হানি হবে না কি?

রকিব সাহেব বললেন, আমাদের ব্যাপারটা আমরা বুঝব, আপনি পড়াবেন কি-না বলুন?

হাফিজ কিছু না বলে চুপ করে চিন্তা করতে লাগল কি বলবে।

রকিব সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কতদূর লেখাপড়া করেছেন?

বি.এ. পাস করেছি।

আশ্চর্য! বি.এ. পাস করে রংমিস্ত্রির কাজ করছেন? চেষ্টা-চরিত্র করে একটা চাকরি জোগাড় করতে পারলেন না?

সে জন্যে কোনো ত্রুটি করিনি। তারপর মৃদু হেসে বলল, আমাদের দেশে একটা প্রবাদ বাক্য আছে। "কপালে নেই তো ঘি, হাঁড়ি ঠকঠকালে হবে কি।" আসলে আমার ভাগ্যটাই এই রকম।

রকিব সাহেব বললেন, ভাগ্যের দোষ দিচ্ছেন কেন? মানুষ পরিশ্রম করে নিজের ভাগ্য নিজে গড়তে পারে।

হাফিজ বলল, আপনার কথাটা কিছু সত্য হলেও পুরোটা নয়। এ সম্বন্ধে পক্ষে-বিপক্ষে দুটো হাদিস মনে পড়ল। প্রথমটা হল, আমাদের নবী করিম (দঃ) বলিয়াছেন, "পরিশ্রমীর ললাটে সৌভাগ্য এবং অলসের ভাগ্যে দুর্ভাগ্য লেখা থাকে।" দ্বিতীয়টা হল, আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, "মানুষ পরিশ্রমের দ্বারা বড় হবার যতই চেষ্টা করুক না কেন, আমি তার ভাগ্যে যা লিখেছি তার চেয়ে এক কণাও সে বড় হতে পারবে না।" আমাদের নবী করিম (দঃ) আরও বলিয়াছেন, "ভাগ্যের কথা চিন্তা করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে না। আল্লাহপাক যে রেজেকদাতা সেই বাণীর উপর বিশ্বাস করে সৎভাব পরিশ্রম করে চলেছি। ভাগ্যে যা আছে তা তো তিনি দেবেনই। কলেজে ভর্তি হওয়ার

পর আব্বা মারা গেলেন। তারপর নানাজী কিছুদিন পড়ার খরচ চালালেন। তিনিও বছর খানেকের মধ্যে মারা গেলেন। নানি স্বামীর ভিটেমাটি বেচে আমাকে পড়াতে লাগলেন। তিনিও বছর পার হল না মারা গেলেন। শেষে আম্মা আমাদের ভিটেটুকু ছাড়া আব্বার যেটুকু জমি ছিল তা বেচে আমাকে বি.এ. পাস করালেন। আম্মার স্বপ্ন ছিল, আমি লেখাপড়া করে বি.এ., এম.এ. পাস করে বড় চাকরি করে সংসারের অভাব-অনটন দূর করব। কিন্তু আম্মার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল। আমিও খুব আশা করে ঢাকায় এসেছিলাম। চিন্তা করেছিলাম, একটা কিছু করতে করতে এম.এ. টা পড়ব। আমার স্বপ্নও সফল হয়নি। প্রায় এক বছর চাকরির জন্য বহু চেষ্টা করেছি। কিন্তু সামান্য একটা পিয়ন অথবা দারোয়ানের চাকরিও জোটাতে পারিনি। কাউকে চাকরির কথা বললেই বলে, কত টাকা ঘুষ দিতে পারবেন আগে বলুন, তারপর চাকরির কথা। শেষে এক আত্মীয়ের পরামর্শে এই কাজ করছি। আত্মীয়টা অবশ্য কয়েকটা টিউশনির ছাত্র-ছাত্রী জোগাড় করে দিয়েছিল। কিছুদিন পড়িয়েও ছিলাম। কিন্তু তাতে শরীর ও মন অলসতায় ভরে যেতে লাগল। আমি গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষের খেটে খাওয়া ছেলে। তাই পড়ান বন্ধ করে এই কাজে নেমেছি। তারপর হাফিজ কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল, মনের আবেগে এতকথা বলে হয়ত আপনাকে বিরক্ত করলাম। মনে কিছু নেবেন না।

রকিব সাহেব বললেন, এতে মনে করার কি আছে? আর বিরক্তই বা হব কেন? আপনার অসুবিধা না থাকলে ইশিতাকে রাতে কিছুক্ষণ পড়াতে পারেন।

হাফিজ বলল, আপনার কাজটা শেষ হোক তারপর জানাব।

রকিব সাহেব বললেন, বেশ, তাই জানাবেন। আমি কিন্তু আর অন্য মাস্টারের খোঁজ করব না।

হাফিজ ঠিক আছে বলে সালাম বিনিময় করে বিদায় নিয়ে চলে এল।

বিলকিস ও ইশিতা এতক্ষণ ড্রইংরুমের ভিতরের দিকের দরজার বাইরে থেকে তাদের কথা শুনছিল। হাফিজ চলে যাওয়ার পর তারা ভিতরে ঢুকল।

রকিব সাহেব তাদেরকে দেখে বললেন, হাফিজকে পড়াবার কথা বললাম। বলল, কয়েকদিন পর জানাবে। জানিস ছেলেটা বি.এ পাস। কোনো চাকরি না পেয়ে এই কাজ করছে। মনে হল খুব সৎ ও ধার্মিক।

দিন পনের পর একদিন দুপুরে বাসায় যখন সবাই একসঙ্গে খাচ্ছিল তখন রকিব সাহেব বললেন, আজ হাফিজ অফিসে এসেছিল। বলল, কাল থেকে সন্ধ্যের পর ইশিতাকে পড়াতে আসবে।

রকিব সাহেব যেদিন হাফিজকে পড়াবার কথা বলেছিলেন, সেদিন তিনি স্ত্রী শাফিয়া বেগমকে তার সব কথা বলে ইশিতাকে পড়াবার ব্যাপারে আলাপ করেছিলেন।

শাফিয়া বেগম রংমিস্ত্রি ছেলেটা বি.এ পাস শুনে অবাক হয়ে বলেছিলেন, বি.এ পাস করে এই কাজ করছে, খুব আশ্চর্যের কথা। মা-বাবা কত আশা নিয়ে ছেলেকে লেখাপড়া করাল, আর সে কি-না চাকরি না পেয়ে রং মিস্ত্রির কাজ করছে? যাক, যদি ইশিতাকে পড়ায়, তা হলে ভালই হবে।

আজ স্বামীর মুখে তার পড়াবার কথা শুনে শাফিয়া বেগম বললেন, কত বেতন দেবে কিছু বলেছ?

রকিব সাহেব বললেন, না বলিনি। আগের মাস্টারকে তো এক হাজার দিতাম। এ যদি তার চেয়ে ভালো পড়ায়, তা হলে বাড়িয়ে দেব।

শাফিয়া বেগম বললেন, তাই দিও।

হাসান এতক্ষণ খেতে খেতে মা বাবার কথা শুনছিল। খাওয়া শেষ করে চলে যাওয়ার সময় বলল, একজন রংমিস্ত্রীকে ইশিতার মাস্টার রাখা ঠিক হল না।

রকিব সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, হাসানের প্রেস্টিজ বোধ প্রখর, তাই না?

শাফিয়া বেগম বললেন, হ্যাঁ, তাই তো বোঝা গেল।

হাফিজ প্রথম দিন ইশিতাকে পড়াতে এসে বুঝতে পারল, সে ছোটবেলা থেকে অংক ও ইংরেজিকে ভয় করে বলে ঐ বই দু'টো কম পড়াশোনা করে। তাই ঐ দুই সাবজেক্টে ভালো রেজাল্ট করতে পারেনি। চিন্তা করল, ওর মন থেকে ভয়টা বুদ্ধি করে তাড়াতে হবে। হাফিজ প্রথমে তাকে টেন্‌স্ শেখাবার সাথে সাথে ইংরেজিতে কথা বলা শেখাতে লাগল। সেই সঙ্গে প্রতিদিন ট্র্যানস্লেশান ও আট-দশটা অংক করাতে লাগল। ফলে চার পাঁচ মাসের মধ্যে ইশিতা যেমন ইংরেজীতে কথা বলতে সক্ষম হল তেমনি অংকেও পারদর্শী হয়ে গেল। এখন ঐ দুই সাবজেক্ট তার কাছে খুব সহজ বলে মনে হয়। ইশিতার মুখে সব সময় হাফিজের গুণগান। হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষায় সে থার্ড হল। ক্লাসমেটেরা ঐ দুই সাবজেক্টে হাই মার্ক পেতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কি রে, কি করে এমন রেজাল্ট করলি?

ইশিতা হাসিমুখে বলল, আমি এমন একজন মাস্টারের কাছে প্রাইভেট পড়ি, যিনি অংক ও ইংরেজিতে জুয়েল।

বাসার সবাই তার রেজাল্ট দেখে হাফিজের প্রতি খুব সন্তুষ্ট হল। আর বিলকিস আনন্দে অধীর হয়েও হাফিজের সঙ্গে দেখা করতে পারছে না। সে আজ প্রায় এক বছর ধরে হাফিজকে ভালোবেসে বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। বাসার কেউ একথা মনে নেবে না। আর সেই বা কি করে তাদেরকে জানাবে, একটা রংমিস্ত্রিকে ভালোবাসে। বিবেকের কষাঘাতে সে হাফিজের পরিচয়ের কথা চিন্তা করে তাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু তার মন কিছুতেই মানে না। বলে, ভালোবাসা কোনোদিন গরিব বড়লোক বা বংশমর্যাদা বিচার করে না। এই দোটানায় পড়ে সে এতদিন হাফিজের সামনে যায়নি। তার পড়াতে আসার সময় হলে তাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে।

তাই সে জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে গেটের দিকে তাকিয়ে থাকে। হাফিজ আসার পরও তার মনের আশা মিটে না। সে যতক্ষণ ইশিতাকে পড়ায় ততক্ষণ নিজের পড়ায় মন বসাতে পারে না। রুম থেকে বেরিয়ে এসে রিডিং রুমের জানালার পর্দা সরিয়ে হাফিজের দিকে তাকিয়ে থাকে।

একদিন শাফিয়া বেগম মেয়েকে ঐ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, কি রে, এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন? কিছু জানার থাকলে ভিতরে গিয়ে জেনে নে।

বিলকিস মায়ের কথা শুনে থতমতো খেয়ে 'পরে জেনে নেব' বলে চলে গেল।

একদিন হাফিজ পড়াতে এলে আয়া চা-নাশতা নিয়ে এসে বলল, ছোট আপা তার বান্ধবীর বার্থ-ডে পার্টিতে গেছে। হাফিজ খাওয়া শেষ করে চলে যাওয়ার জন্য উদ্যত হয়েছে এমন সময় বিলকিসকে বই-খাতা নিয়ে ঢুকতে দেখে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে তাকাল।

বিলকিস ঢোকার সময় হাফিজের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। ফলে বহুদিন পর আবার তাদের চার চোখের মিলন হল।

হাফিজ যখন তাদের বাড়ি রং করছিল তখন মাঝে মাঝে বিলকিস ইশিতার সঙ্গে এলেও ইশিতাকে পড়াতে আসার পর থেকে প্রায় আট-দশ মাস হয়ে গেল কোনো দিন আসেনি। প্রতিদিন পড়াতে আসার সময় হাফিজের মনে হয়, আজ হয়ত বিলকিসের সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু এতদিনেও সে আশা পূরণ হয়নি। ভেবেছে, বিলকিসের চোখের দৃষ্টিতে যা দেখেছিলাম তা কি ভুল? আবার ভেবেছে, এটাই হয়ত আল্লাহপাকের ইচ্ছা। সেই কথা ভেবে আল্লাহপাকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে মনকে প্রবোধ দিয়ে এসেছে। তবু প্রতিদিন পড়াতে এলে একই আশার পুনরাবৃত্তি ঘটে। আজ বিলকিসকে দেখে নিজের অস্তিত্ব ভুলে গেল। সে অপলক নয়নে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তার মনে হল, বিলকিস যেন আগের থেকে অনেক সুন্দরী হয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলতে পারল না।

এক সময় হাফিজ সম্বিত ফিরে পেয়ে সালাম দিয়ে বলল, কেমন আছেন?

বিলকিস হাফিজকে ঐভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। তার কথা শুনে সালামের উত্তর দিয়ে বলল, ভালো। তারপর এগিয়ে এসে টেবিলের উপর বই-খাতা রেখে বলল, দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন।

হাফিজ বসার পর সেও বসে বই খুলে একটা চ্যাপ্টার দেখিয়ে বলল, এটার নোট করে দিন।

হাফিজ চ্যাপ্টারটা পড়ে নোট করতে লাগল।

আর বিলকিস তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর আয়ার 'বড় আপা' ডাক শুনে তাকে ভিতরে আসতে বলল।

আয়া চা-নাশতা নিয়ে এসে টেবিলের একপাশে রেখে জগ থেকে একগ্লাস পানি ঢেলে দিয়ে চলে গেল।

আয়া চলে যাওয়ার পর বিলকিস বলল, আগে নাশতা খেয়ে নিন, তারপর নোট করবেন।

হাফিজ একপলক নাশতার প্লেটের দিকে তাকিয়ে লিখতে লিখতে বলল, আমি তো একটু আগে নাশতা খেলাম। আর খেতে পারব না।

বিলকিস বলল, খেয়েছেন তো কি হয়েছে, নাশতা বারবার খাওয়া যায়।

হাফিজ কিছু বলল না, শুধু তার ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুঠে উঠল।

বিলকিস আবেগের বশে আব্দারের স্বরে বলে ফেলল, কি হল, আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন না? চা তো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কথাটা বলে ফেলে লজ্জায় তার মুখটা লাল হয়ে গেল।

বিলকিসের কথা বলার স্বরে হাফিজের কলম থেমে গেল। মুখ তুলে তার দিকে তাকাতে দেখতে পেল, বিলকিসের সারা মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেছে। লজ্জারাঙা মুখটা আরও সুন্দর বলে মনে হল। তাড়াতাড়ি দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারল না।

বিলকিস নিজের কথার জন্য খুব লজ্জা পেয়েছিল, তার উপর হাফিজকে ঐভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে আরও লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে নিল।

তাই দেখে হাফিজ আবার লিখতে শুরু করার সময় বলল, চা ঠাণ্ডা হোক গে, আমি চা তেমন খাই না। তারপর নোটটা শেষ করে পড়ে বুঝিয়ে দিয়ে বলল, পড়ে দেখুন, কোথাও বুঝতে অসুবিধে হয় কি না।

বিলকিস পড়ে বলল, না, বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। এবার নাশতাটা খেয়ে নিন।

হাফিজ বলল, কেউ সামনে থাকলে আমি একা খেতে পারি না। এটা ইসলামেও নিষেধ। যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে একটা কথা বলব রাখবেন?

রাখব না কেন, বলুন?

একবার নাশতা খেয়ে আর খাবার ইচ্ছা না থাকা সত্বেও আপনার কথায় খেতে পারি যদি আপনিও হাত লাগান।

বিলকিসের মন এই কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করছিল। তবু বলল, ঐ তো সামান্য জিনিস। আপনি খেতে শুরু করুন, আমারটা নিয়ে আসছি বলে উঠে দাঁড়াল।

হাফিজ বলল, বসুন। আর আনার দরকার নেই। যা আছে ফিফটি ফিফটি খাব।

নাশতা ছিল দু'টো বড় রসগোল্লা আর দু'টো সিঙ্গাড়া। হাফিজ একটা রসগোল্লা তুলে নিয়ে বলল, নিন শুরু করুন।

নাশতা খেয়ে বিলকিস জিজ্ঞেস করল, চা খাবেন, নিয়ে আসব?

হাফিজ বলল, তার আর দরকার নেই। একটু আগে বললাম না, আমি চা বেশি খাই না।

বিলকিস বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

করুন।

আপনি চাকরির চেষ্টা করেন নি কেন?

কে বলল করিনি। কাগজে ভ্যাকান্সি দেখে প্রায়ই অ্যাপ্লিকেশন করি। আগে অবশ্য অনেক অফিসে ছোটাছুটি করেছি, অনেক লোককে ধরেছি; কিন্তু ভাগ্যে নেই, তাই হয়নি। দু'এক জায়গায় যে চান্স পাই নি তা নয়। সেখানে আবার মোটা টাকা ঘুষ চায়। আমি ঘুষ দিয়ে চাকরি পেতে চাই না।

বিলকিস বলল, আজকাল ঘুষ তো প্রফেশন হয়ে গেছে। অফিস-আদালতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে ঘুষ ছাড়া কোনো কাজ হয় না। আর এটাকে কেউ দোষ বলেও মনে করে না। অনেক মোল্লা-মৌলবীরাও খায়।

অফিস-আদালতের কথা যা বললেন তা ঠিক। কিন্তু মোল্লা-মৌলবীদের কথা আপনি জানলেন কি করে?

আমাদের পাশের বাড়িওয়ালার এক মেয়ে আমার সঙ্গে পড়ে। তার কাছে শুনেছি, তার এক মামা একজনের স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করে তাকে তাদের বাসায় নিয়ে এসে বিয়ে করেছে। এ বিয়ে কি সিদ্ধ হয়েছে? যে মৌলবী বিয়ে পড়িয়েছে, সে ঘটনাটা জেনেও টাকার লোভে বিয়ে পড়িয়েছে।

হাফিজ বলল, ঘটনাটা যদি সত্য হয়, তা হলে বিয়ে সিদ্ধ হয়নি। ঐ সমস্ত মৌলবীরা মুসলিম সমাজের প্রভূত ক্ষতি সাধন করছে। আর আমরা এই সমস্ত গর্হিত কাজের কথা জেনেও তার প্রতিকার করছি না বলে আমাদের উপর আল্লাহপাকের নানা রকম গজব আসছে। বিলকিস কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, থাক ওসব কথা, আজ আসি। তারপর সালাম বিনিময় করে বিদায় নিল।

কয়েকদিন পরে ইশিতাকে পড়াবার সময় বিলকিস নোট করাতে এলে হাফিজ বলল, আগের নোটটা কোনো প্রফেসরকে দেখিয়েছিলেন? ভালো না হলে শুধু শুধু নোট নিয়ে কি লাভ?

বিলকিস বলল, দেখিয়েছিলাম। ভালো হয়েছে বলেই তো আবার এলাম।

ইশিতা বলে উঠল, আমাদের স্কুলের স্যাররা তো আপনার নোটের খুব প্রশংসা করেন।

হাফিজ কিছু না বলে বিলকিসের বইটা নিয়ে নোট কবতে লাগল।

এরপর থেকে বিলকিস মাঝে মাঝে এসে নোট করে নেয়।

এ বছর ইশিতা সেকেণ্ড হয়ে ক্লাস টেনে উঠল। সে হাফিজকে ভীষণ ভক্তি শ্রদ্ধা করে। হয়ত এতদিনে তাকে ভালবেসে ফেলত। যদি না সে বুঝতে পারত আপা স্যারকে ভালবাসে। ইশিতা হাফিজকে 'স্যার' বলে ডাকে। আর হাফিজ তাকে তার নাম ধরে ডাকে। ইশিতা আপাকে প্রায়ই জানালার পর্দা ফাঁক করে স্যারের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে। একদিন কৌতুহল চাপতে না পেরে স্যার পড়িয়ে চলে যাওয়ার পর বিলকিসকে জিজ্ঞেস বলল, আপা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব, বকবে না বল।

ছোট বোনের কথা বলার ধরণ দেখে বিলকিসের বুকটা ধক করে উঠল। ভাবল, সে কি ইশিতার কাছে ধরা পড়ে গেছে? সামলে নিয়ে বলল, বকবার কথা বললে বকা খাবি। বল না কি কথা বলবি?

না বাবা, বলার আর দরকার নেই। শুধু শুধু বকা খেতে যাব কেন?

আচ্ছা বকব না, এবার বল কি কথা বলবি বলছিলি।

আমি প্রায়ই লক্ষ্য করি; তুমি জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে স্যারের দিকে তাকিয়ে থাক। নোট করতে এসেও স্যারের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাক। কেন থাক বলবে?

শুনে বিলকিসের হার্টবিট বেড়ে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, এমনি দেখি। তাতে কি হয়েছে?

দু'একবার দেখলে কিছু হয় না, কিন্তু বারবার দেখলে হয়।

কি হয় বল তো শুনি।

ভালোবাসা হয়।

দেব এক চড় বলে বিলকিস তাকে হাত তুলে মারতে গেল।

ইশিতা তৈরি ছিল। ছুটে পালাবার সময় বলল, তোমার রাগটাই যা সত্য তা প্রমাণ করে দিল।

বিলকিস ছুটে গিয়েও তাকে ধরতে পারল না। ভাবল, ও কি মা-বাবাকে বলে দেবে? আবার ভাবল, বলুক গে, একদিন তো সবাই জানবে।

একদিন পড়তে পড়তে ইশিতা হাফিজকে জিজ্ঞেস করল, স্যার আপনি কি কোনো মেয়েকে ভালোবাসেন?

কথাটা শুনে হাফিজ চমকে উঠল। সামলে নিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল, বড়দেরকে এরকম কথা জিজ্ঞেস করতে নেই। করলে বেআদবি হয়।

ইশিতা বলল, আমি তো আপনার ছোট বোনের মতো। ছোট বোন হয়ে বড় ভাইকে এরকম কথা জিজ্ঞেস করলে বেআদবি হবে কেন? ছোট বোনের নিশ্চয় জানার অধিকার আছে। আপনি বলুন না, কোনো মেয়েকে ভালোবাসেন কিনা, আর সে মেয়েও আপনাকে ভালোবাসে কি না।

ইশিতার কথায় হাফিজ প্রথমে মনে করেছিল, সে হয়ত নিজেকে উপলক্ষ করে বলছে। পরে তার কথা শুনে নিশ্চিত হয়ে বলল, গরিবদের ভালোবাসা করতে নেই। তা ছাড়া আমার মতো হতভাগাকে কোন মেয়ে ভালোবাসবে? এখন ওসব কথা বাদ দিয়ে পড়।

ইশিতা বলল, আর একটু স্যার, সত্যি যদি কোনো মেয়ে আপনাকে ভালোবাসে, তা হলে তাকে কি আপনি ডিনাই করবেন?

হাফিজ বিলকিসের চোখের দৃষ্টি ও তার কথাবার্তায় বুঝতে পেরেছে সে তাকে ভালোবাসে এবং সে নিজেও বিলকিসকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ভালোবেসে ফেলেছে। কিন্তু নিজের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করে নিজেকে কঠোরভাবে সামলে রেখেছে। মুহূর্তের জন্যেও ঘুণাক্ষরে সে কথা বিলকিসকে জানতে দেয়নি। এখন ইশিতার কথা শুনে চিন্তা করল, সে কি বুঝতে পেরেছে, তার আপা আমাকে ভালোবাসে?

হাফিজকে চুপ করে থাকতে দেখে ইশিতা জিজ্ঞেস করল, কি হল স্যার, কিছু বলছেন না কেন?

হাফিজ বলল, সে রকম ঘটনা ঘটতেই পারে না। যদি সে রকম কিছু ঘটে, তা হলে তখন চিন্তা-ভাবনা করে দেখা যাবে।

ইশিতা আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। সে জানালার দিকে আপাকে দেখে পড়ায় মন দিল।

স্যার পড়িয়ে চলে যাওয়ার পর ইশিতা বিলকিসের রুমের দরজার কাছে গিয়ে দেখল, সে খাটে বসে আছে। বলল, কি আপা, স্যার কি বলল নিশ্চয় শুনেছ? একবার প্রেম নিবেদন করে টেস্ট করবে নাকি?

বিলকিস কপট রাগ দেখিয়ে বলল, তুই দিন দিন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিস। এত ডেঁপো হয়েছিস ভাবতে পারছি না।

ইশিতা বলল, এতে ডেঁপো হওয়ার কি হল? তুমি স্যারকে ভালোবাস, তাতে কিছু হল না। আর সে কথা বলতে আমি ডেঁপো হয়ে গেলাম।

ওকে মারার জন্য বিলকিস বলল, কাছে আয় একটা কথা বলব।

ইশিতা আপার মতলব বুঝতে পেরে বলল, কি বলবে বল। আমি কানে কালা নই যে, এখানে থেকে তেমার কথা শুনতে পাব না।

বিলকসি একটু রাগের সঙ্গে বলল, তুই বড় ফাজিল হয়ে গেছিস। দাঁড়া, ভাইয়াকে বলে তোকে মার খাওয়াব।

ইশিতা ছেলেবেলা থেকে একটু দুষ্টু। মাঝে মাঝে আপার সঙ্গে দুষ্টুমি করে। বিলকিস সে কথা ভাইয়াকে বলে দেয়। হাসান তখন ইশিতাকে বকা দেয়। কখানো-সখনো দু'একটা চাঁটিও লাগায়।

আপার কথা শুনে ইশিতা বলল, তা হলে তুমিও রেহাই পাবে না। ভাইয়া যখন আমাকে ফাজলামির কথা জিজ্ঞেস করবে তখন আমি তোমার স্যারকে ভালোবাসার কথা বলব।

বিলকিস একটু ঘাবড়ে গেলে। ছোটবোনকে চিনে। কথা বলার সময় কোনো কিছু রেখে ঢেকে বলে না। সে নরম সুরে বলল, দুর পাগল, আমি কি আর সত্যি সত্যি ভাইয়াকে বলে তোকে মার খাওয়াব? এমনি একটু ভয় দেখালাম।

ইশিতা হেসে উঠে বলল, তুমি বি.এ পড়লে কি হবে আমার চেয়ে বোকা। আমিও যে তোমাকে ঐ কথা বলে ভয় দেখালাম, সেটা বুঝতে পারলে না।

বিলকিসও হেসে উঠে বলল, তাই না হয় আমি তোর চেয়ে বোকা; কিন্তু তুই আমাকে বোকা বলতে গিয়ে নিজেই প্রমাণ করলি তুইও বোকা।

ইশিতা নিজের কথায় নিজে বোকা হয়ে কিছু বলতে পারল না। চুপ করে রইল।

তাই দেখে বিলকিস এগিয়ে এসে তার একটা হাত ধরে বলল, তুই তো আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিস। তোর স্যারকে কিন্তু এ ব্যাপারে আর কোনোদিন কিছু বলবি না।

না বললে স্যার জানবে কি করে তুমি তাকে ভালোবাস?

নাই জানুক, তবু বলবি না।

তুমি নিজে জানাতে চাও বুঝি?

হ্যাঁ, জানাব। তবে এখন নয়। যদি কখনও সময় সুযোগ আসে তখন বুঝলি? তোমার জন্য আমার খুব ভয় হয়।

কেন?

স্যার সব দিক থেকে খুব ভালো ছেলে হলে কি হবে, সে গরিব এবং রংমিস্ত্রি। মা, বাবা ও ভাইয়া কি তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবে?

যদ্দিন-না ও ভালো কিছু একটা করবে ততদিন আমি অপেক্ষা করব।

বোঝা যাচ্ছে তুমি স্যারকে ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছ।

তোর যদি তাই মনে হয়, তা হলে তাই। তোকে একটা কথা বলে রাখি, এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলবি না।

ঠিক আছে, বলব না।

সেদিন আর দু'বোনের মধ্যে কোনো কথা হল না। এরপর থেকে ইশিতা স্যারকে আগের থেকে বেশি ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে লাগল।

বিলকিসের বি.এ পরীক্ষা শেষ হওয়ার কয়েকদিন পর হাসান মা-বাবাকে বলল, আমি একটা ভালো ছেলের সন্ধান পেয়েছি। ছেলেটা এম.এ.। নাম সুমন। সরকারী অফিসে বড় পদে চাকরি করে। তাদের বংশ ভালো। দেখতে-শুনতেও ভালো। কোনো নেশাটেশা করে না। এ রকম ছেলে আজকাল পাওয়া যায় না। তোমরা যদি বল, তা হলে তার বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারি। ছেলেটার বাবাও সরকারী বড় অফিসার ছিলেন। রিসেন্টলি রিটায়ার করেছেন। তিনি ছেলেকে আগেই নিজের অফিসে লাগিয়েছিলেন। রিটায়ার করার পর ছেলে বাবার পোস্ট পেয়েছে। ঢাকাতে বাড়ি-গাড়ি আছে।

স্বামী কিছু বলার আগে শাফিয়া বেগম বললেন, ছেলের সম্বন্ধে যা বললি তা যদি হয়, তা হলে আমরা অমত করব কেন?

রকিব সাহেব বললেন, তোমার কথা ঠিক। কিন্তু তার আগে বিলকিসকে কথাটা জানান দরকার।

হাসান বলল, তা তোমরা জানাও। তবে একটা কথা মনে রেখ, সব সময় ভালো ছেলে পাওয়া যায় না।

সেদিন রাতে রকিব সাহেব বিলকিসকে ডেকে বললেন, হাসান একটা ভালো পাত্রের কথা বলছিল। তারপর পাত্রের সম্বন্ধে সবকিছু বলে তার মতামত জানতে চাইলেন।

বিলকিস সব শুনে ভাইয়ার মতলব বুঝতে পারল। বলল, তোমরা ভাইয়ার বিয়ের ব্যবস্থা কর। আমার কথা ভেবো না। আমি এম.এ পড়ব। তোমরা আমার বিয়ে দেওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করছ কেন?

রকিব সাহেব বললেন, কিন্তু মা, সব সময় ভালো ছেলে আজকাল পাওয়া যায় না।

বিলকিস বলল, আমার ভাগ্যে যা আছে হবে। আমি এখন বিয়ে করব না।

রকিব সাহেব বললেন, ঠিক আছে, তোর অমতে আমি কিছু করব না। তবু আর একটু ভেবে দেখিস। ছেলেটাকে হাসানের খুব পছন্দ।

বিলকিস দৃঢ়স্বরে বলল, আমার ভাবাভাবির কিছু নেই। আমি এখন পড়াশোনা করব।

তারপর বাবার অনুমতি নিয়ে নিজের রুমে চলে গেল।

বাবার মুখে বিলকিসের অমতের কথা শুনে হাসান রেগে গেল। বলল, তুমিই তো আস্কারা দিয়ে অমন করেছ। নচেৎ তোমার মুখের উপর অমত করত না। ছেলেটার

বাব অফিসে ফোন করেছিল। আমি তাদের বিলকিসকে দেখার জন্য আসতে বলেছি। ছেলের মা-বাবা আগামীকাল আসবেন।

রকিব সাহেব বললেন, আসে আসুক। তাতে অসুবিধে কি?

পরের দিন ছেলের মা-বাবা এসে বিলকিসকে দেখে পছন্দ করে গেলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন, ছেলে তার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে একদিন আসবে। আপনারাও ছেলে দেখুন। ছেলে মেয়ে উভয়ে উভয়কে দেখুক।

তারা চলে যাওয়ার পর ইশিতা বিলকিসকে বলল, আপা, তুমি এখনও চুপ করে থাকবে? যদি বল তা হলে আমি তোমার মতামত মা-বাবাকে বলব।

বিলকিস বলল, তোকে কিছু বলতে হবে না। যা বলার আমি বলব। ঐদিন রাতে সে হাফিজকে একটা চিঠি লিখল–

হাফিজ,

তোমাকে তুমি করে লিখছি বলে কিছু মনে করো না। কারণ তোমাকে প্রথম দেখার পর থেকে আমার হৃদয়ে তুমি, তুমি হয়ে গেঁথে আছ। তাই কথা বলার সময় এতদিন আপনি করে বললেও আজ লিখতে বসে তুমি করে লিখছি। আমার মনের খবর তুমি নিশ্চয় জান। আর তুমি যতই নিজেকে গুটিয়ে রাখ না কেন, আমিও তোমার মনের খবর জানি। এখন তোমাকে এসব বলার ইচ্ছা আমার ছিল না। ভেবে রেখেছিলাম, যেদিন তুমি ভালো একটা কিছু করবে সেদিন আমার মনের বাসনা তোমাকে জানাব। সেটা আর হল না। ভাইয়া আমায় বিয়ে দেয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। তার কারণ হল, সে একটা মেয়েকে ভালোবাসে। আমরা সবাই সে কথা জানি। মা-বাবারও সেই মেয়েকে পছন্দ। তারা তাকে বৌ করে ঘরে আনতে চেয়েছিল। ভাইয়া রাজি হয়নি। সে চায় আমার বিয়ে দিয়ে বিয়ে করবে। এতদিন পড়াশোনা করছিলাম বলে অপেক্ষা করছিল। এই পত্র কেন দিলাম তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। তবু একটা অনুরোধ করব, আমার কি করা উচিত পত্রের দ্বারা জানাবে। পত্র বাহকের হাতে উত্তর পাব এই আশা নিয়ে ইতি টানলাম।

বিলকিস।

পরের দিন ইশিতা হাফিজের কাছে পড়তে যাওয়ার আগে বিলকিস পত্রটা তার হাতে দিয়ে বলল, তোর স্যারকে দিস্

ইশিতা কয়েক সেকেণ্ড আপার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আমার যে পড়তে ইচ্ছে করছে।

বিলকিস মৃদু হেসে বলল, ইচ্ছে করলে পড়বি।

সত্যি বলছ?

হ্যাঁ, সত্যি বলে বিলকিস চলে গেল।

ইশিতা চিঠিটা পড়ে রিডিং রুমে হাফিজের কাছে পড়তে এল। পড়ান শেষ হয়ে যেতে হাফিজ যখন চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল তখন ইশিতা একটা বইয়ের মধ্যে থেকে চিঠিটা বের করে তার হাতে দিয়ে বলল, আপা দিয়েছে।

কথাটা শুনে হাফিজ চমকে উঠল। তারপর রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

বিলকিস নিজের রুম থেকে হাফিজকে চলে যেতে দেখে ইশিতার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, কি রে, চিঠিটা দিয়েছিস?

হ্যাঁ, দিয়েছি।

কিছু বলেনি?

না, শুধু একটু চমকে উঠেছিল।

কয়েকদিন থেকে হাফিজের শরীর খারাপ ছিল বলে কাজ করেনি। কিন্তু ইশিতাকে পড়াতে যাচ্ছিল। আজ তাকে পড়িয়ে এসে শরীরটা বেশি খারাপ মনে হল। যার বাসায় থাকে তার বছর দশেকের ছেলেটাকে ডেকে বলল, শরীরটা ভালো না। তোমার মাকে বল, আজ আমি কিছু খাব না। তারপর এশার নামায পড়ে এক গ্লাস পানি খেয়ে ঘুমোবার আগে বিলকিসের চিঠিটা পড়ে খুব চিন্তায় পড়ে গেল। ভাবল, এখন আমি কি করতে পারি? বেশিক্ষণ সে চিন্তা করার অবকাশ পেল না। তার তখন ভীষণ জ্বর উঠেছে। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা অনুভব হতে গায়ে চাদর জড়িয়ে কোনোরকমে বাথরুমে গিয়ে ট্যাপের নিচে মাথা রেখে বেশ কিছুক্ষণ পানি দিল। খুব শীত পেতে রুমে এসে কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। চাচাতো ভাই মোসলেম প্রতিদিন ভোরে উঠে হাফিজকে মসজিদে নামায পড়তে দেখে। আজ তাকে মসজিদে দেখেনি। নাশতা খাওয়ার সময় তার রুমের দরজা বন্ধ দেখে খুলে ভিতরে ঢুকে দেখল, সে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে। কাছে গিয়ে কয়েকবার নাম ধরে ডেকে সাড়া না পেয়ে গায়ে হাত দিয়ে জাগাতে গিয়ে বুঝতে পারল, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে স্ত্রী মাসুদাকে বলল, হাফিজের ভীষণ জ্বর। তুমি তার মাথায় পানি ঢালার ব্যবস্থা কর। আমি ডাক্তার আনতে যাচ্ছি।

মাসুদা ছেলেকে সঙ্গে করে বালতি-বদনা নিয়ে এসে তার মাথায় পানি দিতে লাগল।

মোসলেম ঘণ্টা খানেক পরে ডাক্তার নিয়ে ফিরে এল।

ডাক্তার হাফিজকে পরীক্ষা করে প্রেসক্রিপশান করার সময় বললেন, জ্বর এক'শ তিন ডিগ্রীর নিচে না নামা পর্যন্ত পানি ঢালা বন্ধ করবেন না। আর এই ওষুধগুলো নিয়ে এসে খাওয়ান। তারপর তিনি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

প্রায় পনের দিন জ্বরে ভুগে হাফিজ ভালো হয়ে আজ গুলশান মার্কেটে পার্কে এসে বসেছিল। জ্বর থেকে ভালো হওয়ার পর সায়রার কথামতো টাকা পাঠাতে পারেনি বলে এবং বিলকিসের চিঠির উত্তর কি লিখব, এইসব ভেবে ভেবে খুব অস্থির হয়ে পড়েছিল। বাসাতে তার কিছুতেই মন টিকছিল না। তাই পার্কে এসে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যখন খেলা দেখছিল তখন তার দেশের কথা একের পর এক মনের পর্দায় ভেসে উঠতে থাকে। তারপর ইশিতার সঙ্গে দেখা। নানান চিন্তায় তার মাথাটা দপদপ করতে লাগল। কোনো রকমে নামায পড়ে বাসায় ফিরল।

ইশিতা বাসায় ফিরে এলে বিলকিস তাকে রাগারাগি করে বলল, এত দেরি করলি যে? এদিকে এখনও কত কাজ বাকি।

ইশিতা বলল, বা-রে তুমি বকছ কেন? জিনিসপত্র কিনে ফেরার সময় স্যারের সঙ্গে দেখা। পার্কে বসে ছিলেন। স্যার অনেক দিন জ্বরে ভুগে খুব রোগা হয়ে গেছেন। তার সঙ্গে কথা বলতে দেরি হয়ে গেল। হাফিজের অসুখের কথা শুনে বিলকিসের মনটা খারাপ হয়ে গেল। নরম সুরে বলল, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলি না কেন?

ইশিতা বলল, সে কথা বলেছিলাম। রাজি হলেন না। বললেন, শরীরে এখনও শক্তি ফিরে আসেনি।

বিলকিস জিজ্ঞেস করল, তার বাসার ঠিকানা জেনেছিস?

না, সে কথা আমার খেয়াল হয়নি।

তুই একটা বুদ্ধু। তারপর আবার বলল,ঠিক আছে, চল এখন কাজগুলো সেরে ফেলি।

হাফিজ সুস্থ হয়ে কাজ করছে। কিন্তু ইশিতাকে আর পড়াতে যায় না। ভেবেছে, ইশিতাকে পড়াতে গেলে বিলকিসের পত্রের উত্তর দিতে হবে। এই পরিস্থিতিতে তার উত্তরে কি লিখবে। একদিন পোস্ট অফিসে গিয়ে বাড়িতে কিছু টাকা মনি অর্ডার করে হাফিজ বাসায় ফিরছিল। হঠাৎ তার পাশে একটা গাড়ি থামতেই সে চমকে উঠে এক পাশে সরে গেল। বিলকিসকে গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এসে সালাম দিয়ে বলল, আপনি? কেমন আছেন।

বিলকিস সালামের উত্তর দিয়ে পাশের দরজা খুলে দেয়ার সময় বলল, উঠে এস।

হাফিজ ইসস্তত করে বলল, দেখুন, আমার একটু কাজ আছে, বাসায় যাব।

বিলকিস বলল, কিছুক্ষন পরে গিয়ে সেই কাজ করো। তোমার কোনো আপত্তি শুনব না।

হাফিজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাড়িতে উঠে বলল, কোথায় গিয়েছিলেন?

বিলকিস গাড়ি ছেড়ে দিয়ে বলল, কোথাও যাইনি। ক'দিন থেকে মানসিক বিপর্যয়ে ভুগছি। বাসায় কিছুতেই মন টিকছিল না। তাই বাবার কাছ থেকে গাড়ি চেয়ে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি। আর সেই সঙ্গে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কি ব্যাপার বলতে পার? তোমার অসুখ হয়েছিল জানাওনি কেন? এখন তো দেখছি বেশ সুস্থ। ইশিতাকে পড়াতে যাচ্ছ না কেন? আমার ভাবা কি অন্যায় হবে, তোমাকে চিঠি দিয়েছি বলে অসন্তুষ্ট হয়েছ?

হাফিজ বিলকিসকে তুমি সম্বোধনে কথা বলতে শুনে খুব বিব্রত বোধ করে বলল, আপনি ভুল পথে অগ্রসর হচ্ছেন। আমি জেনে শুনে আপনার সঙ্গী হতে পারি না।

বিলকিস রাস্তার পাশে একটা রেস্টুরেন্ট দেখে গাড়ি পার্ক করাল। তারপর গাড়ি থেকে নেমে হাফিজকে নামতে বলল। হাফিজ নামার পর তাকে সঙ্গে নিয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকে একটা কেবিনে বসল। বেয়ারাকে নাশতার অর্ডার দিয়ে হাফিজকে বলল, আমি ভুল পথে চলছি তাই না? আর আপনি বুঝি সঠিক পথে চলছেন?

হাফিজ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমার জ্ঞানমতো আমি কোনো অন্যায় পথে চলছি না। আপনি যদি আমার জায়গায় হতেন, তা হলে আমার কথার সত্যতা বুঝতে পারতেন।

তা হয়ত পারতাম; কিন্তু আমি তোমাকে তুমি করে বলছি, আর তুমি কিনা আমাকে আপনি করে বলছ?

আমার সে যোগ্যতা নেই।

প্রেম কোনো দিন যোগ্যতার বিচার করে না।

আবার আপনি ভুল করছেন।

এমন সময় বেয়ারা অর্ডার মতো সবকিছু দিয়ে গেল।

বিলকিস খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল, আমার চিঠি পেয়ে সত্যি কি তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছ?

হাফিজ কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল না।

তা হলে সুস্থ হওয়ার পর ইশিতাকে পড়াতে যাওনি কেন? আমার চিঠির উত্তরই বা দাওনি কেন?

কারণ আছে।

কারণটা বল।

মাফ করবেন, বলতে পারব না।

না বললে মাফ করব না।

গরিবদের সব কথা শুনতে নেই।

আমি শুনব।

বারবার ভুল করতে যাচ্ছেন।

আমি যে ভুল করছি না, সে জ্ঞান আমার আছে।

জ্ঞানীরাও অনেক সময় ভুল করে থাকেন।

তোমার কথা অস্বীকার করছি না, তবে আমি যে ভুল করছি না, তা আমি নিশ্চিত।

বেশির ভাগ লোক নিজের ভুল নিজে ধরতে পারে না।

বিলকিস একটু রেগে গিয়ে বলল, তুমি কি আমার ভালোবাসাকে অস্বীকার করতে চাও? না আমি তোমার ভালোবাসার পাত্রীর অনুপযুক্ত?

হাফিজ বলল, আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন? রেগে গেলে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আপনি যে সমস্ত প্রশ্ন করলেন, সেগুলোর উত্তর দিতে আমি অক্ষম।

রেগে যাওয়াটা ভুল হয়েছে বুঝতে পেরে বিলকিস বলল, হিতাহিত জ্ঞান হারাবার মতো আমি রাগিনি। তবু যদি রেগে ভুল কিছু করে থাকি, সেটা ধরিয়ে দাও। সংশোধন করার চেষ্টা করব।

সে ক্ষমতাও আমার নেই। থাকলে প্রথমেই ধরিয়ে দিতাম।

একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে?

উত্তর জানা থাকলে দেব।

তুমি আমাকে ভালোবাস, না ঘৃণা কর?

হাফিজ এতক্ষণ নিজেকে সংযত রেখে কথা বলছিল। বিলকিসের এই কথা শুনে সংযমের বাঁধ ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হল। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করল। তারপর বলল, আপনার প্রশ্নটা সহজ হলেও উত্তর দেয়াটা আমার পক্ষে কঠিণ।

কারণ?

গরিবদের প্রেম-ভালোবাসা শুধু স্বপ্ন। তাদের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়, কোনো দিন বাস্তবে রূপ নেয় না।

গরিবদের বুঝি মন বলে কিছু নেই? তারা বুঝি কাউকে ভালোবাসে না?

তা থাকবে না কেন? তাদের যেমন মন আছে তেমনি প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসাও আছে। তবে সেগুলো ক্ষেত্র বিশেষে হয়। তা না হয়ে যদি ভিন্ন ক্ষেত্রে হয়, তা হলে গরিবদের জন্যে সেগুলো অভিসম্পাত ডেকে আনে।

নিজেকে এত ছোট ভাব কেন?

আমি যে তাই।

গ্র্যাজুয়েট হয়ে একথা বলতে পারলে? এটা কিন্তু আমি আশা করিনি।

আপনি তো অনেক কিছু আশা করেন, তাই না?

প্রত্যেক মানুষই তা করে।

কিন্তু প্রত্যেকের সেই আশা পূরণ হয় কি? হয় না। শুধু তাদেরই হয় যাদের ভাগ্যে আল্লাহপাক লিখে রেখেছেন।

তোমার ভাগ্য যে লেখা নেই, তা তো তুমি জান না। ভবিষ্যতে তোমার আশা পূরণ হতে পারে।

সেটা ভাগ্য যিনি লিখেছেন তিনিই জানেন। যারা ভবিষ্যৎকে নিয়ে আকাশকুসুম ভাবে, তাদের ভাগ্যে না থাকলে তারা চিরকাল সেই আশার পিছনে ছুটে শেষে ভাগ্যকে দোষ দেয়। আমি বর্তমানকে সব সময় ভাবি এবং তাকে মেনে নিয়ে চলার চেষ্টা করি।

মানুষের মনে উঁচু আশা থাকা কি তা হলে অন্যায়?

উচ্চ আশা থাকা অন্যায় হবে কেন? বরং ভালো। তাই বলে বর্তমানকে মেনে না নিয়ে হতাশায় ভোগা অন্যায়। তারপর বলল, মাপ করবেন, এবার আমি উঠব।

তোমার বাসার ঠিকানাটা দাও।

আমার কাছে কলম থাকলেও কাগজ নেই।

বিলকিস ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে তার হাতে দিল।

হাফিজ ঠিকানা লিখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বিলকিসও দাঁড়িয়ে বলল, ইশিতাকে কি আর পড়াতে আসবে না?

আর বোধ হয় পড়াতে পারব না। তবে একদিন গিয়ে বাসার সকলের সঙ্গে দেখা করে আসব। আর সেই সময় পড়াতে পারব কি না জানাব।

না পড়াবার কারণটা আমি, না আমার চিঠি?

এই কথা শুনে হাফিজ আবার বেসামাল হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। চোখে পানি এসে গেল। পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছে বলল, এই প্রশ্ন গাড়িতে উঠতেই একবার করেছিলে। উত্তর দিতে অক্ষম জানার পরও এখন আবার করলে। বারবার আমার মনে কাঁটা বিঁধিয়ে খুব আনন্দ পাও বুঝি? তা না হলে একবারও কি ভেবে দেখেছ, কেন তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না? তুমি কি জান, আমরা কত গরিব? আমার মা আমাকে লেখাপড়া করিয়ে বড় করার জন্য স্বামীর যা জমি-জায়গা ছিল তা বিক্রি করেছে? এখন সে অসুস্থ। তার চিকিৎসার জন্য টাকা পাঠাতে পারিনি। টাকার জন্যে ছোট বোনের লেখাপড়া হয়ত বন্ধ হয়ে গেছে। তারা দু'বেলা পেট পুরে খেতে পায় না। কোনো কোনো দিন উপোস করে থাকে। আমি একজন শিক্ষিত যুবক হয়ে মা-বোনকে খাওয়াতে-পরাতে পারছি না, অসুখে চিকিৎসা করাতে পারছি না। এই অবস্থায় তোমার চিঠি পেয়ে কি উত্তর দেব ভেবে দেখ। এখন যে প্রশ্নগুলো করলে, তারই বা কি উত্তর দেব বলতে পার? কথা বলতে বলতে হাফিজের চোখে আবার পানি এসে গেল।

হাফিজের কথা শুনতে শুনতে বিলকিসের চোখেও পানি এসে গেছে। চোখ মুছে ভিজে গলায় বলল, এত কিছু না জানলেও কিছুটা জানতাম। কেন আমি তোমাকে বারবার একই প্রশ্ন করে তোমার মনে কাঁটা বিঁধিয়েছি, সে কথা পরে বলছি। আগে তুমি বল, তোমার মনে দুঃখ দিয়ে যে অন্যায় করেছি, তা ক্ষমা করে দিয়েছ?

হাফিজ বলল, অন্যায় বুঝতে পেরে যে ক্ষমা চায় সে ক্ষমার যোগ্য হয়ে যায়। যে ক্ষমাপ্রার্থীকে ক্ষমা করে না সে মানুষ নামের অযোগ্য।

বিলকিস বলল, তুমি আমাকে কতটা ভালোবাস তা জানার জন্য এবং তোমার মুখ থেকে 'তুমি' সম্বোধন শুনব বলে বারবার একই প্রশ্ন করে তোমার মনে কাঁটা বিঁধিয়েছি। আজ আল্লাহ আমার বাসনা পূরণ করলেন। এবার চল।

হাফিজ কিছু না বলে বেরিয়ে এসে তার সঙ্গে গাড়িতে উঠল।

বিলকিস গাড়ি ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কবে থেকে ইশিতাকে পড়াতে আসছ?

হাফিজ বলল, এখন ঠিক বলতে পারছি না। গেলেই জানতে পারবে। আমাকে মহাখালি হাসপাতালের গেটে নামিয়ে দেবে।

বিলকিস ও হাফিজ যে কেবিনে বসে আলাপ করছিল, তার পাশের কেবিনে কিছুক্ষণ আগে থেকে হাসান তার প্রেমিকা সীমাকে নিয়ে চা খাচ্ছিল। সে কেবিনের পর্দার ফাঁক থেকে হাফিজের সঙ্গে বিলকিসকে দেখে যেমন অবাক হল, তেমনি বেশ রেগে গেল। তার কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল।

হাসানকে কথা বলতে বলতে থেমে গিয়ে চিন্তা করতে দেখে সীমা জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার, হঠাৎ চুপ করে গেলে যে? মনে হচ্ছে কিছু চিন্তা করছ?

সীমা বিলকিস ও হাফিজকে চিনে। তার কথায় হাসান বুঝতে পারল, সে ওদেরকে দেখতে পাইনি। বলল, না, তেমন কিছু না। একটা কথা মনে পড়ল। তাই একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। চল, ওঠা যাক। সীমা যাতে জানতে না পারে বিলকিস

হাফিজের সঙ্গে এখানে এসেছে। সেই জন্যে তাড়াতাড়ি করে সীমাকে নিয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এল।

সীমা বড়লোকের মেয়ে। ভার্সিটিতে পড়ার সময় হাসানের সঙ্গে মন দেয়া-নেয়া হয়। সীমারা দু'ভাই দু'বোন। সীমাই সবার বড়। অন্যান্য ভাই-বোনেরা লেখাপড়া করছে। সীমা ও হাসানের ব্যাপারটা তাদের গার্জেনরা জানেন। এ ব্যপারে তাদের কোনো অমত নেই। উভয়ে উভয়ের বাসাতে অবাধে যাতায়াত করে। হাফিজ যখন হাসানদের বাড়ি রং, করে সেই সময় সীমা দু'তিন বার হাফিজকে দেখেছে, তার সঙ্গে কথাও বলেছে।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে হাসান সীমাকে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বাসায় ফিরল। বিলকিসকে হাফিজের সঙ্গে দেখার পর থেকে একটা প্রশ্ন তার কেবলই মনে হচ্ছে, সে কি হাফিজকে ভালোবাসে? সেই জন্যে কি বিলকিস এখন বিয়ে করতে চাচ্ছে না? যদি তাই হয়, তা হলে তো মা-বাবাকে জানিয়ে এর একটা বিহিত করতে হয়। চিন্তা করল, সামনের মাসে পাত্র তার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ওকে দেখতে আসবে। তখন ওর মতামত জানা যাবে। এখন আর কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। তবে ব্যাপারটা সত্য কি না জানা দরকার।

পরের মাসে পাত্রের বাবা ফোন করে জানালেন, সরকার সুমনকে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য বিদেশ পাঠিয়েছে। ফিরতে মাস তিনেক দেরি হবে। বিদেশ থেকে ফেরার পর যা করার একেবারে পাকাপাকি করা যাবে।

এক মাস পার হয়ে গেল অথচ হাফিজ এল না দেখে বিলকিস বেশ চিন্তিত হল। তাকে দেখার জন্য তার মন খুব অস্থির হয়ে উঠল।

এদিকে ইশিতা তার পড়ার ক্ষতি হচ্ছে বলে বারবার আপাকে স্যারের কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল।

বিলকিস বলল, সে হয়তো কোনো কাজে আটকা পড়েছে।

ইশিতা বলল, তুমি একবার তার সঙ্গে দেখা করছ না কেন?

বিলকিস বলল, আর কয়েকদিন দেখি, তারপর না হয় যাব।

এক ছুটির দিন সকালে নাশতা খাওয়ার পর হাসান চলে যেতে বিলকিস বাবাকে বলল, তুমি কি আজ বিকেলে কোথাও বেরোবে?

রকিব সাহেব বললেন, কেন বল তো?

গাড়িটা একটু নেব।

তা নিতে পারিস। তবে সন্ধ্যের পর আমি বেরোব।

থ্যাংক ইউ বাবা, সন্ধ্যের আগেই আমি ফিরব।

বেলা দু'টোর দিকে বিলকিসকে সাজতে দেখে ইশিতা বলল, কোথায় যাবে আপা?

ফিরে এসে বলব।

আমাকে সঙ্গে নেবে?

না, তোকে সেখানে নিয়ে যাওয়া চলবে না।

বিলকিস সকালে যখন বাবাকে গাড়ির কথা বলছিল তখন ইশিতা সেখানে ছিল। এখন তার কথা শুনে ভাবল, সে স্যারের সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করতে যাচ্ছে। বলল, যদি স্যারের কাছে যাও, তা হলে আমাকে পড়াবার ব্যাপার বলতে ভুলো না।

বিলকিস মৃদু হেসে বলল, আমি যে তার কাছে যাচ্ছি বুঝলি কি করে?

ইশিতা বলল, এমনি মনে হল তাই বললাম। কথা শেষ করে চলে গেল।

আল্লাহপাকের অপার করুণায় হাফিজ জয়দেবপুরে একটা বিদেশী ফার্মে চাকরি পেয়েছে। অসুখ থেকে উঠে কাগজে রিসিপশনিস্টের পদে লোক নেয়া হবে দেখে দরখাস্ত করেছিল। ইন্টারভিউর সময় তার ইংরেজী ভাষার উপর দখল দেখে এবং বচন-ভঙ্গি শুনে সাহেব তাকে সিলেক্ট করেছেন। ইন্টারভিউর তিনদিন পর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়ে সে অফিস করছে। কয়েকদিন অফিসে কাজ করেও সে বিশ্বাস করতে পারছে না, তার সত্যি সত্যি চাকরি হয়েছে। তাই চাকরির কথা এখনও সে চাচাতো ভাই মোসলেমদের বাসায়ও জানায় নি। তাদেরকে শুধু বলেছে, চাকরির ব্যাপারে জয়দেবপুরে ছোটাছুটি করছে। তবে আল্লাহপাকের শোকরগুজারি করে দেশে চিঠি দিয়ে মা ও বোনকে জানিয়েছে। আরও জানিয়েছে, এতদিন যখন তোমরা কষ্ট করেছ তখন আর কয়েকটা দিন কষ্ট করে কাটাও। বেতন পেয়ে যদি ছুটি পাই যাব, নচেৎ অনেক টাকা পাঠাব। অফিস থেকে ফিরতে রাত ন'টা বেজে যায়। অফিসটা নতুন। দু'জন রিসিপশনিস্টের কাজ তাকে একা করতে হচ্ছে। আর একজনের জন্য অনেকের ইন্টারভিউ নেয়া হয়েছে, কিন্তু সাহেবের কাউকে পছন্দ হয়নি। সাহেব হাফিজকে বলেছেন, যে ক'দিন লোক না নেয়া হচ্ছে, সে ক'দিন তাকে ওভার টাইম করতে। তাই তার ছুটি আড়াইটায় হলেও ফিরতে দেরি হয়। ভেবেছে, আর একজন অ্যাপয়েন্টমেন্ট হওয়ার পর ইশিতাকে পড়াতে যাবে। চাকরি হওয়ার পর বিলকিসকে নিয়ে হাফিজ অনেক ভাবে। তার একটা কথা বারবার মনে পড়ে, "ভাগ্যে কি লেখা আছে তা তো তুমি জান না, ভবিষ্যতে তোমার আশা পূরণ হতে পারে।" তার মনে হয় বিলকিসের ভাগ্য খুব ভালো। তাই হয়ত সে চিঠিতে এবং সামনাসামনি তার মনের খবর জানাবার পরপরই এই চাকরিটা হল। তখন তার বিবেক বলে উঠল, এ রকম চিন্তা করা ঠিক নয়। ভাগ্যে আল্লাহপাক যা লিখেছেন তা হবেই। একজনের ভাগ্যের দ্বারা অন্যের ভাগ্য খুলে না। চাকরি পাওয়ার পর এক শুক্রবার পার হয়ে গেছে। সেদিন মানসিক অস্থিরতার জন্য বিলকিসদের বাসায় যাইনি। ভেবেছে, আগামী শুক্রবার গিয়ে তাকে একটা সারপ্রাইজ দেবে। এখনও অফিসে নতুন লোক নেয়া হয়নি। তাই সারাদিন অফিসের কাজ করে এসে রাতে খেয়েদেয়ে ঘুমাতে যাওয়ার সময় ছাড়া বিলকিসের কথা ভাববার সময় পায় না। এভাবে আরওএক সপ্তাহ পার হয়ে গেল।

আজ শুক্রবার। হাফিজ জুম্মার নামায পড়ে খেয়েদেয়ে বিছানায় শুয়ে চিন্তা করল, বিকেলে আসরের নামাযের পর বিলকিসদের বাসায় যাবে। বিলকিসের সঙ্গে দেখা হয়েছে প্রায় মাসখানেকের উপর। তারও এক-দেড় মাস আগে থেকে তাদের বাসায় যায় না। গেলে ইশিতা তো তার পড়ার ক্ষতিপূরণ দাবি করবেই। সেই সঙ্গে বিলকিসও এতদিন না যাওয়ার কৈফিয়ত চাইবে। এইসব ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে

পড়ল। মাসুদা ভাবির ডাকে জেগে গিয়ে চোখ না খুলেই বলল, তোমাকে বলেছি না, আমাকে কখনও ঘুম থেকে জাগাবে না? তুমি তো জান আমার ঘুম কম। আবার ঘুমাবার চেষ্টা করে বলল, এখন তুমি যাও।

মাসুদা ভাবি বলল, তোমাকে জাগাতে আমার দায় পড়েছে। এদিকে তাকিয়ে দেখ না, কে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে?

হাফিজ পাশ ফিরে শুয়ে ছিল সেই অবস্থাতেই বলল, এই অভাগার এমন কেউ নেই যে, দেখা করতে আসবে। তুমি যাও তো বিরক্ত করো না।

বিলকিস মাসুদাকে ইশারা করে তার কাছ থেকে সরে আসতে বলল। মাসুদা সরে এলে সে এগিয়ে গিয়ে বলল, হাফিজ, আমি বিলকিস। বিলকিসের কথা শুনে হাফিজের মনে হল, সে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখছে। তার সমস্ত শরীর ও মনে আনন্দের স্রোত বইতে শুরু করল। সে চুপ করে তা অনুভব করতে লাগল।

হাফিজকে চুপ করে থাকতে দেখে কয়েক সেকেণ্ড বিরতি দিয়ে বিলকিস আবার বলল, কি হল উঠছ না কেন? তা হলে কি আমি ভাবব, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছ না?

হাফিজ আর শুয়ে থাকতে পারল না। ধড়ফড় করে উঠে বিলকিসকে দেখে সালাম দিয়ে অবিশাস্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আমি স্বপ্ন দেখছি না তো?

বিলকিস বলল, স্বপ্ন অনেক সময় বাস্তব হয়।

মাসুদা স্বামী ও ছেলেমেয়েদের খাইয়ে তারপর নিজে খেয়ে বাসার সামনের কলতলায় থালা-বাসন মাজছিল। এমন সময় অল্প দূরে রাস্তায় একটা প্রাইভেট কারকে থামতে দেখল। একটু পরে একটা অপরূপ সুন্দরী যুবতী মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে তার কাছে এসে তাদের বাসার নাম্বার বলে লোকেশন জানতে চাইলে মাসুদা তাকে বলল, ঐ নাম্বারের বাসায় আমরা থাকি। আপনি কাকে চাচ্ছেন?

বিলকিস বলল, হাফিজ কি আপনাদের বাসায় থাকে?

মাসুদা থালা-বাসন মাজা বন্ধ রেখে বলল, হ্যাঁ। তারপর হাত ধুয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে হাফিজের রুমে আসার সময় জিজ্ঞেস করল, আপনি কোথা থেকে এসেছেন?

গুলশান থেকে।

পরিচয়টা বললে খুশি হব।

হাফিজ আমার ছোট বোন ইশিতাকে পড়ায়। অনেক দিন পড়াতে যায়নি। তাই খোঁজ নিতে এলাম।

ঠিক আছে আসুন, সে এখন ঘুমাচ্ছে।

তারপর বিলকিসকে সাথে করে হাফিজের রুমে নিয়ে এসে তাকে জাগাল। এখন তাদের কথা শুনে মাসুদা যা বোঝার বুঝে গেল। বলল, তোমরা কথা বল, আমি তোমাদের চা করে নিয়ে আসি।

মাসুদা চলে যাওয়ার পর হাফিজ বলল, দাঁড়িয়েই থাকবে, বসবে না?

বিলকিস একটা চেয়ার দেখতে পেয়ে তাতে বসে বলল, ছেলেদের মন একটু শক্ত শুনেছি; কিন্তু এত শক্ত তা শুনিনি।

হাফিজ বলল, তোমার কথাটা সত্যি না মিথ্যা জানি না। তবে সব শোনা কথা সত্য নয়। প্রয়োজনে ছেলেমেয়ে সবার মন শক্ত হয়।

বিলকিস বলল, তা না হয় মানলাম; কিন্তু তুমি এতদিন নিখোঁজ রয়েছ কেন?

হাফিজ মৃদু হেসে বলল, মানুষ নিখোঁজ হয়, রয় না।

তুমি তো রয়েছ।

কি জানি, তুমি যখন বলছ তখন তাই।

কিন্তু কেন, বলবে তো?

কারণ নিশ্চয় আছে। সেটা পরে বলছি। তুমি কেমন আছ আগে বল?

শারীরিক দিক থেকে ভালো ছিলাম; কিন্তু মন ভালো ছিল না।

সে জন্যে আমি নিশ্চয় দায়ী?

জেনেও জিজ্ঞেস করছ কেন?

ক্ষমা পাওয়ার জন্য।

কারণটা বললে পাবে।

হাফিজ বিলকিসকে পরীক্ষা করার জন্য বলল, দেখ বিলকিস, আমি তোমাকে নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি। আমার কেবলই মনে হয়, তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে খুব ভুল করেছি। কারণ তোমার-আমার মধ্যে আর্থিক ও সামাজিক পার্থক্য অনেক। আমার সবকিছু তোমার মা-বাবা ও ভাইয়া জানেন। তারা তোমাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দেয়া তো দূরের কথা, আমাদের মেলামেশার কথা জানতে পারলে কি পরিস্থিতি হবে চিন্তা করে দেখেছ? তোমাদের একটা সোসাইটি আছে। সেই সোসাইটিতে আমার কি পরিচয় দেবে, সেটাও কি চিন্তা করে দেখেছ? আর সব থেকে বড় কথা, তুমি যে সোসাইটিতে মানুষ হয়েছ, সেই সোসাইটি ত্যাগ করে আমাদের পাড়াগাঁয়ের গরিব লোকের সোসাইটিতে গিয়ে কি জীবন কাটাতে পারবে? আমার আর্থিক অবস্থার কথা তোমার অজানা নয়। আমাকে বিয়ে করে সারা জীবন দুঃখ কষ্টে কাটাতে হবে। আজকালের প্রেম-ভালবাসার মধ্যে দুঃখ কষ্টের স্থান নেই। দুঃখ-কষ্টে পড়লে প্রেম-ভালোবাসা কর্পূরের মত উড়ে যায়। তখন অনুশোচনার অন্ত থাকে না। মনে হবে কি করে এই বন্দিশালা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। উভয়ের দাম্পত্য জীবনে অভিসম্পাত নেমে আসবে। আসলে আজকালের প্রেমই বল আর ভালোবাসাই বল, সবকিছু আবেগপ্রবণ। খাঁটি প্রেম-ভালোবাসা এ জগতে বিরল। তাই ভেবে-চিন্তে ঠিক করেছি, প্রেম ভালোবাসা যখন মনের ব্যাপার তখন মনেই থাকুক। তাকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে নিজেদের ও গার্জেয়ানদের মনে দুঃখ দিয়ে লাভ নেই। যে যার বাস্তব জীবনকে মেনে নিয়ে কর্তব্য পালন করে যাওয়া উচিত।

বিলকিস হাফিজের কথা শুনতে শুনতে খুব রেগে গেল। তাকে থামিয়ে দিয়ে রাগের সঙ্গে বলল, তোমার বলা শেষ হয়েছে? না আরও বলবে?

হাফিজ বিলকিসকে রেগে যেতে দেখে একটু ঘাবড়ে গেল। বলল, না, আমার আর কিছু বলার নেই।

তা হলে আমিও দু'একটা কথা বলি?

বেশ তো বল কি বলবে।

তোমার কথা শুনে আমার কি মনে হচ্ছে, জান?

কি?

তুমি একটা কাপুরুষ।

তোমাকে বিয়ে করে দুঃখের ও অশান্তির সাগরে ভাসিয়ে প্রেমকে কলুষিত করলে বুঝি সুপুরুষের কাজ হত?

বিলকিস 'কাওয়ার্ড' বলে রাগে ফুলতে ফুলতে রুম থেকে বেরিয়ে চলে যেতে লাগল।

হাফিজ ভাবতেই পারেনি, তার কথা শুনে বিলকিস রাগ করে হঠাৎ চলে যাবে। সে তাড়াতাড়ি তার পিছনে আসতে আসতে বলল, বিলকিস প্লীজ যেও না। একটা কথা শুনে যাও। বিলকিস কিন্তু থামল না। সে গাড়ির কাছে এসে যখন দরজা খুলছে তখন হাফিজ এসে তার একটা হাত ধরে ভিজে গলায় বলল, আমাকে ভুল বুঝে চলে গেলে আমার মনে কষ্ট হবে।

বিলকিস ঝাপটা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে গাড়িতে উঠে বলল, কাপুরুষের আবার মন বলে কিছু আছে নাকি? আমি একজন কাপুরুষকে ভালোবেসেছি জেনে নিজেকে ঘৃণা বোধ করছি। তারপর গাড়ি স্টার্ট দিয়ে চলে গেল।

হাফিজ তার গাড়ির দিকে হ্যাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপর ফিরে আসার সময় চিন্তা করল, আমি তো ভালো কথাই বললাম। তাতে বিলকিস এত রেগে গেল কেন? তা হলে বিলকিস কি আমাকে মনেপ্রাণে ভালোবাসেনি? না মনেপ্রানে ভালবেসেছিল বলে আমার কথায় আমাকে কাপুরুষ ভেবে রাগ করে চলে গেল? প্রথমটা যদি সত্য হয়, তা হলে বিয়ের পর সারা জীবন অশান্তি ভোগ করার চেয়ে এখন যা ঘটল তা ভালই হল। আর দ্বিতীয়টা যদি সত্য হয়, তা হলে তার ভুল একদিন না একদিন সে বুঝতে পারবেই। ততদিন আমি তার পথ চেয়ে থাকব।

মাসুদা এতক্ষণ নাশতা তৈরি করছিল। চা-নাশতা নিয়ে এসে হাফিজকে একা চুপচাপ বসে চিন্তা করতে দেখে বলল, কি ব্যাপার ভদ্রমহিলা কই?

চলে গেছে।

কিছু না খাইয়ে যেতে দিলে কেন? অবশ্য নাশতা করতে আমার একটু দেরি হয়ে গেল। হাফিজ ভাবির কথায় লজ্জা পেয়ে বলল, তুমি যা ভাবছ তা নয়। মহিলার ছোট বোনকে আমি প্রাইভেট পড়াতাম। অসুখ হওয়ার পর থেকে আর পড়াতে যাইনি। তাই খোঁজ নিতে এসেছিল। সে বড়লোকের মেয়ে, আমাদের মতো গরিব লোকের বাড়ির নাশতা খেতে পারবে কেন?

মাসুদার মনে সন্দেহ হল, তা হলে কি কোনো ব্যাপারে হাফিজের সঙ্গে রাগ করে চলে গেল। বলল, আমরা গবির জেনেই তো এসেছিল। নিশ্চয় কোনো কারণে তোমার উপর রাগ করে চলে গেছে?

তাই যদি তুমি মনে কর, তা হলে তাই। তুমি এগুলো নিয়ে যাও। আসরের আযান হয়ে গেছে। এখন আমি নামায পড়তে চললাম বলে হাফিজ আলনা থেকে পাঞ্জাবিটা নিয়ে বেরিয়ে এল।

মাসুদা আর কি করবে, চা-নাশতা নিয়ে ফিরে গেল।

হাফিজ নামায পড়ে এসে চিন্তা করল, আজ তাদের বাসায় গিয়ে বলে আসবে ইশিতাকে আর পড়াতে পারবে না। তার জন্যে ইশিতার পড়ার অনেক ক্ষতি হচ্ছে। এই কথা চিন্তা করে সে রওয়ানা দিল। সে যখন তাদের বাসায় গিয়ে পৌঁছল তখন তারা সবাই চা খাচ্ছিল। শুধু বিলকিস সেখানে ছিল না। আর হাসান একটু আগে বেরিয়ে গেছে।

হাফিজকে দেখে রকিব সাহেব বললেন, আরে হাফিজ যে, কেমন আছ বল? তিনি হাফিজকে প্রথম দিকে আপনি করে বলতেন, ইশিতাকে পড়াতে শুরু করার পর হাফিজের অনুরোধে তুমি করে বলেন।

হাফিজ সালাম দিয়ে বলল, আল্লাহপাকের রহমতে ভালো আছি। আপনারা কেমন আছেন?

রকিব সাহেব সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, ভালো। শুনেছিলাম, তোমার অসুখ করেছিল। তা সে তো অনেক দিন হয়ে গেল। এতদিন ইশিতাকে পড়াতে আসনি কেন? ও তোমার কথা প্রায়ই বলে। কি রে ইশিতা, তুই কিছু বলছিস না কেন?

ইশিতা বলল, আমার পড়ার অনেক ক্ষতি হয়েছে। এবার তা পূরণ করে দিতে হবে স্যার।

রকিব সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, এতদিন কি ঢাকায় ছিলে না?

ঢাকাতেই ছিলাম, চাকরির ব্যাপারে একটা বিদেশী ফার্মে বেশ কিছুদিন ছোটাছুটি করতে হয়েছে।

তা চাকরিটা হয়েছে তো?

জ্বি হয়েছে।

শুনে খুব খুশি হলাম। তা হলে ইশিতাকে কি পড়াতে পারবে না?

সেই কথা বলার জন্য এসেছি।

ইশিতা বলল, তা হবে না স্যার। আমার টেস্ট পরীক্ষার মাত্র এক মাস বাকি। আপনাকে পড়াতেই হবে। আপনার কোনো আপত্তি শুনব না।

রবিক সাহেব বললেন, তোমার যদি তেমন অসুবিধে না হয়, তা হলে ওর ফাইন্যাল পরীক্ষা পর্যন্ত পড়াও। এখন অন্য মাস্টার পাওয়া খুব মুশকিল। তোমার অফিস টাইম ক'টা থেকে ক'টা পর্যন্ত।

আটটা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত। তবে নতুন অফিস, সব লোক অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়নি। এতদিন রাত আটটা পর্যন্ত ডবল ডিউটি দিতে হচ্ছিল। তাই আপনাদের এখানে আসবার সময় করে উঠতে পারিনি। গতকাল কয়েকজনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়েছে। আগামী কাল থেকে আড়াইটায় ছুটি পাব।

রকিব সাহেব বললেন, তা হলে ইশিতাকে এই ক'মাস অন্তত পড়াতে পার।

হাফিজ বলল, ঠিক আছে পড়াব।

রকিব সাহেব বললেন, তোমরা কথা বল, আমি একটু বেরোব। তারপর তিনি বেরিয়ে গেলেন।

ইশিতা হাফিজকে বলল, আজ কয়েকটা অংক বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন স্যার?

হাফিজ বলল, কেন দেব না, চল।

ইশিতা তাকে পড়ার রুমে নিয়ে এসে অংকগুলো দেখিয়ে দিয়ে বলল, আপনি এগুলো করুন, আমি আসছি বুঝিয়ে দেবেন। তারপর অনুমতি নিয়ে চলে গেল।

ইশিতা কিছুক্ষণ আগে বিলকিসকে মন খারাপ করে ফিরে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায় গিয়েছিলে আপা? তোমার মন এত খারাপ কেন?

পরে বলব, এখন বিরক্ত করিস না বলে বিলকিস নিজের রুমে চলে গেছে। ইশিতার তখন মনে হল, স্যারের সঙ্গে কি আপার কোনো গোলমাল হয়েছে। তারপর নাশতা খাওয়ার সময় আপা আসছে না দেখে মা আয়াকে দিয়ে তাকে ডেকে পাঠাতে বলেছে, তার শরীর খারাপ, সে এখন কিছু খাবে না। সে কথা শুনে সন্দেহটা দৃঢ় হয়। তাই স্যারকে অংক করতে বলে তার রুমে গেল। দেখল, আপা বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে। কাছে গিয়ে বলল, আপা তুমি কাঁদছ কেন?

বিলকিস একরোখা ধরনের মেয়ে। নিজের মতামতকে বড় করে দেখে। কাউকে বড় একটা পরোয়া করে না। তার মা ও ভাইয়া এই জন্যে তার প্রতি মাঝে মাঝে অসন্তুষ্ট হন। রকিব সাহেব তাকে অন্য ছেলেমেয়েদের চেয়ে একটু বেশি স্নেহ করেন। বাবার কাছ থেকে আদর পেয়ে বিলকিস এই রকম হয়েছে। সে জন্যে রকিম সাহেবকে মাঝে মাঝে হাসান ও শাফিয়া বেগম দায়ি করেন।

আজ বিকেলে হাফিজের কথা শুনে বিলকিসের মনে হয়েছিল, সে তাকে গভীরভাবে ভালোবাসে না। তাই ঐসব বলে এড়িয়ে যেতে চায়। তখন তার মাথা গরম হয়ে যায় এবং রাগ সামলাতে না পেরে তাকে কাওয়ার্ড ভেবে চলে আসে। বাসায় এসে রাগ পড়ে যেতে হাফিজের কথাগুলো চিন্তা করে বুঝতে পারল, হাফিজ তাকে গভীরভাবে ভালোবাসে বলে এবং বিয়ের পরে যাতে কোনো রকম ভুল বোঝাবুঝি না হয়, সেই জন্য ঐসব কথা বলে তাকে বোঝাতে চেয়েছিল। অথবা ঐসব বলে পরীক্ষা করেছিল। বিলকিস নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনার আগুনে জ্বলছিল। প্রতিকারের উপায় চিন্তা করতে করতে চোখের পানিতে সেই আগুন নেভাবার চেষ্টা করছিল। ইশিতার কথা শুনে উঠে বসে চোখ মুখ মুছে বলল, জানিস, আজ হাফিজের সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছি।

ইশিতা বলল, তাতে কি হয়েছে! ভুল সবাই করে। সে জন্যে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিও। স্যার একটা বিদেশী ফার্মে খুব ভালো চাকরি পেয়েছেন, তা কি তুমি জান?

বিলকিস আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলল, সত্যি বলছিস?

হ্যাঁ, সত্যি।

তুই কি করে জানলি?

ইশিতা বুঝতে পারল, স্যার এসেছেন আপা জানে না। বলল, একটু আগে স্যার মা-বাবা সবার সামনে বললেন।

সে এসেছে এতক্ষণ বলিসনি কেন? আছে, না চলে গেছে?

আছে। আমি তাকে যে অংকগুলো পারিনি, সেগুলো করতে দিয়ে তোমার কাছে এসেছি। স্যার আমাকে আর পড়াতে চাচ্ছিলেন না। বাবার কথায় ও আমার জিদে পড়াতে রাজি হয়েছেন। আজকেই তার কাছে তোমার ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত।

বিলকিস মৃদু হেসে বলল, তুই মাঝে মাঝে এমন কথা বলিস, যেন তুইই আমার আপা।

ইশিতা বলল, এত আর পাম দিতে হবে না। অনেক দেরি করে ফেললাম। স্যার কি মনে করছেন কি জানি? আমি যাই। তুমি কিছুক্ষণ পরে এস, ততক্ষণে অংকগুলো বুঝে নেব। তারপর চলে গেল।

হাফিজ তাকে দেখে বলল, এতক্ষণ কি করছিলে? এস অংকগুলো বুঝে নাও।

ইশিতা অংকগুলো বুঝে নেয়ার সময় মাঝে মাঝে জানালার দিকে তাকিয়ে দেখছিল আপা আছে কিনা। বোঝান শেষ হতে ইশিতা বলল, আর একটু বসুন আমি আসছি। তারপর সে বেরিয়ে এসে আপাকে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভিতরে যেতে বলে সেখান থেকে চলে গেল।

বিলকিস একটু সময় নিয়ে দরজার পর্দা ঠেলে ঢুকে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। শত চেষ্টা করেও লজ্জায় কিছু বলতে পারল না।

হাফিজ মনে মনে বিলকিস যে তার সঙ্গে দেখা করবে সেটাই আশা করছিল। তাকে ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন, বস।

বিলকিস ঐ অবস্থাতেই বলল, আগে বল ক্ষমা করেছ?

ক্ষমা না করতে পারলে এলাম কেন? তুমি তো তখন আমার সব কথা না শুনে রাগ করে চলে এলে। তাতে আমার মনে কষ্ট হয়নি বুঝি?

বিলকিস মাথা তুলে তার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসে বলল, ওসব কথা বলে আর লজ্জা দিও না। বাসায় এসে আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। সে জন্যে তখন থেকে অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হচ্ছি। তোমার মুখে ক্ষমা পেয়েছি না শোনা পর্যন্ত সে আগুনে নিভবে না।

হাফিজ বলল, বারবার ক্ষমা চেয়ে আমাদের ভালোবাসাকে অপমান করো না। ভালোবাসা এত ঠুনাকো জিনিস নয় যে, সামান্য কারণে তা ছিন্ন হয়ে যাবে। যদি তা হয়, তা হলে বুঝতে হবে সেই ভালোবাসায় খাদ ছিল। সেখানে মোহ অথবা স্বার্থ ছিল। ঐভাবে চলে আসার পর বুঝতে পেরেছিলাম, তুমি আমাকে গভীরভাবে ভালোবাস। তাই আমার কথাগুলো বুঝতে না পেরে রাগ করে চলে এসেছ। আর তোমার ভালোবাসার প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তাই তখন মনে হয়েছে তোমার ভুল তুমি বুঝতে পারবে।

তার প্রতি হাফিজের গভীর ভালোবাসার কথা বুঝতে পেরে বিলকিসের মনটা যেমন আনন্দে ভরে গেল তেমনি নিজেকে আরওঅপরাধী মনে করল। উঠে এসে তার একটা হাত ধরে বলল, প্লিজ হাফিজ, আর কিছু বলো না। তুমি আমাকে এত ভালোবাস,. তা আমি ভাবতে পারছি না। ইশিতার কাছে তোমার চাকরি হয়েছে জেনে আমি যে কত খুশি হয়েছি তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। কিন্তু এই সুখবরটা আমি সবার শেষে জানতে পারলাম।

হাফিজ বলল, মনে হচ্ছে সে জন্যে তুমি মনে কষ্ট পেয়েছ। আমিও কিন্তু কম কষ্ট পাচ্ছি না। সুখবরটা তোমাকে আগে জানাব বলে এতদিন যাদের বাসায় থাকি তাদেরকেও জানাইনি। তোমাকে জানাবার আগে একটু পরীক্ষা করার জন্যে তখন ঐসব বলেছিলাম। আর তুমি কিনা আমাকে ভুল বুঝে চলে এলে। সুখবরটা বলার সুযোগও দিলে না।

বিলকিস বলল, দুজনের ভাগ্যে এটা লেখা ছিল, তাই এরকম হল।

হাফিজ বলল, সন্ধ্যে হয়ে আসছে নামায পড়তে হবে, এবার আসি।

বিলকিস বলল, আর একটু বস। ইশিতাকে বলে যাও। নচেৎ আমাকে জ্বালাতন করে মারবে।

হাফিজ বলল, যাই বল, ইশিতা কিন্তু খুব সরল ও সুন্দর মেয়ে।

আর আমি বুঝি খুব বাঁকা ও অসুন্দর?

হাফিজ তার চিবুক ধরে চোখে চোখ রেখে বলল, তুমি শুধু বাঁকা ও অসুন্দর নও, সেই সঙ্গে চোর ও খুনী।

প্রমাণ করতে পারবে?

নিশ্চয়।

কর।

এই চোখ দিয়ে বাঁকা পথে তুমি আমার মনকে চুরি করে প্রেমের অস্ত্র দিয়ে খুন করেছ।

আর তুমি বুঝি সাধু? ঐভাবে তুমিও তো আমার মনকে চুরি করে খুন করেছ।

সেদিক দিয়ে আমরা দু'জন সমান দোষী। কিন্তু কথাটা আগে আমি তুলিনি। ইশিতা তোমার বোন। তাকে আমার চেয়ে তুমি বেশি জান। আমি কি তার সম্বন্ধে অন্যায় কিছু বলেছি?

না, তা বলনি। তুমি কি আমার কথায় রাগ করলে? এমনি একটু জোক করার জন্য বললাম।

না, করিনি। তোমার বলার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে আমিও একটু জোক করলাম। যাক, ইশিতাকে তুমি নাহয় একটু ডেকে দাও। নচেৎ মসজিদে যেতে যেতে নামাযের সময় আখেরী হয়ে যাবে।

তা দিচ্ছি। নামাযটা এখানে না হয় পড়ে নাও।

হাফিজ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, তাই পড়ে নিই।

বিলকিস অ্যাটাচ বাথরুম খুলে দিয়ে বলল, তুমি অযু করে নাও, আমি নামাযপাটি নিয়ে আসি।

হাফিজ অযু করে রাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখল, বিলকিস নামাযপাটি হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাত থেকে সেটা নিয়ে বিছিয়ে নামায পড়তে লাগল। নামায শেষ করে দেখল, দু'বোন দাঁড়িয়ে আছে। নামাযপাটি ভাঁজ করার সময় বলল, এটাকে খুব্ সাবধানে ব্যবহার করবে। কারণ এতে কাবা শরীফের ও রসুল (দঃ)-এর রওজা শরীফের ছবি রয়েছে। কেউ যেন এই দু'জায়গায় পা না দেয়।

কথাটা শুনে দু'বোন বেশ অবাক হল। বিলকিস বলল, এ রকম কথা তো আর কারো কাছে শুনিনি। খালা বা ফুপু যখন আসে তখন মা এটাকে পাশের দিকে বিছিয়ে

তাদের সঙ্গে নামায পড়ে। যদি অন্যায় হত, তা হলে তারা ঐভাবে বিছিয়ে নামায পড়ত না।

হাফিজ বলল, শুধু তোমার মা, ফুপু ও খালা নয়, বেশিরভাগ মানুষকে এবং বহু আলেমকেও আমি এই সব ছবিযুক্ত নামাযপাটির উপর ঐভাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখেছি। এমন কি দেশের অনেক বড় বড় মসজিদে শীতকালে এই ছবি ছাপা দামী ভেলভেটের নামাযপাটি বিছান থাকে। আর সমস্ত মুসুল্লিরা ঐ সব ছবির উপর দ্বিধাহীনভাবে পা মাড়িয়ে যেমন নামায পড়ছে তেমনি যাতায়াতও করছে। এটা ন্যায় না অন্যায় তা বলব না। তবে সারা পৃথিবীর মুসলমান নরনারীর কাছে দু'টো প্রশ্ন রাখছি ঃ প্রথমটা হল, "মুসলমানরা সারা জাহানের মধ্যে কোন্ কোন্ স্থানকে সব থেকে বেশি পবিত্র মনে করে এবং সম্মান করে?" কেউ কেউ বলতে না পারলেও বেশিরভাগ লোক বলবে, মক্কার কাবা শরীফ এবং মদীনার রসুল (সঃ)-এর রওজা মোবারক। আর দ্বিতীয়টা হল, "আল্লাহপাক কাদেরকে সব থেকে বেশি সম্মান করতে বলেছেন?" এটার উত্তরও অনেকে দিতে না পারলেও বেশিরভাগ মানুষ বলবে-পিতা মাতাকে। হাদিসে আছে, রসুল (দঃ) বলিয়াছেন, "তোমাদের কেহ মুমেন বা পূর্ণ বিশ্বাসী হইতে পারে না যতক্ষণ আমি তাহার নিকটা স্বীয় পিতা, সন্তান এবং অন্যান্য সকল মানুষ হইতে অধিকতর প্রিয় না হই।[১]" এবার আমি সমস্ত মানুষের কাছে জানতে চাই, কেউ কি তার পিতামাতার ছবির উপর পা দিয়ে মাড়াতে পারবেন? যদি উত্তরটা 'না' হয়, তা হলে তাদের কাছে আমার প্রশ্ন, পিতামাতার চেয়ে লক্ষকোটিগুণ বেশি যে দুটো সম্মানীয় স্থান, সেই সব ছবির উপর পা মাড়ান কি উচিত? আল্লাহপাক পিতামাতাকে যেমন সব থেকে বেশি সম্মান করতে বলেছেন, তেমনি তাদের সঙ্গে এতটুকু বেয়াদবি করতেও নিষেধ করেছেন। তাদের কথা মাথায় নিয়ে মানাতে বলেছেন। আর আল্লাহপাকের রসুল (দঃ) পূর্ণ ঈমানদার হওয়ার জন্য যে কথা বলেছেন, সেই কথা মোতাকেব আল্লাহর ঘর কাবা শরীফের ও রসুল (দঃ)-এর রওযা শরীফের ছবিতে পা মাড়ালে যেমন হবে জঘন্য বেয়াদবি পরোক্ষভাবে তেমনি তাঁদেরকে অসম্মান দেখান হয় না কি? যেখানে পিতামাতা সম্মানীয় বলে আমরা তাদের ছবিতে পা মাড়াতে পারি না, সেখানে আল্লাহপাকের পবিত্র ঘর এবং রসুল (দঃ)-এর রওযা মোবারকের ছবির উপর কোনো সাহসে পা মাড়াতে পারি? এটা যে অত্যন্ত বেয়াদবি হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আসল কথা কি জান, এর পিছনে দু'দল লোক কাজ করছে। প্রথম দলকে শয়তান ক্যাপচার করে তাদেরকে দিয়ে এই কাজ করাচ্ছে। আর অন্য দল ব্যবসায়িক স্বার্থে ভালোমন্দ বিচার না করে এই সব ছবি নামাযের মসাল্লার মধ্যে ছাপছে। সাধারণ মুসলমানরা এই দুই পবিত্র স্থানের ছবি দেখে ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে নামায পড়ার জন্য কিনছে। কিন্তু অজ্ঞতার কারণে সে রকম আদবের সঙ্গে ব্যবহার করছে না। ফলে তারা কত বড় বেয়াদবি করে ফেলছে তা চিন্তা করলে গা শিউরে উঠে। তারপর হাফিজ কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল, এবার ব্যপারটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ?

(১) বর্ণনায় : হযরত আনাস (রাঃ) –বুখারী, মুসলিম।

বিলকিস বলল, বুঝব না কেন, সত্যিই আমরা একথা কখনও চিন্তা করিনি।

শাফিয়া বেগম নামায পড়ে হাফিজকে নামাযের ব্যাপারে কথা বলতে শুনে দরজার বাইরে থেকে এতক্ষণ শুনছিলেন। এবার ভিতরে এসে বললেন, তুমি খুব দামী কথা বলেছ বাবা। এতদিন না জেনে অনেক বেয়াদবি করে ফেলেছি। আল্লাহ মাফ করুন। তোমার কাছে আজ জানতে না পারলে আরওগুনাহ্ করে ফেলতাম। তারপর তিনি তওবা আস্তাগফার পড়তে পড়তে চলে গেলেন।

হাফিজ ইশিতার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমরা নামায পড়?

ইশিতা বলল, ছোট বেলায় কুরআন পড়া শেখার জন্য যখন আব্বা মৌলবী রেখেছিলেন তখন তার কাছে নামায শিখে ঠিকমতো পড়তাম। এখন আর.....বলে থেমে গেল।

হাফিজ বলল, বড় হয়ে এখন আর পড় না তাই না? একটা কথা মনে রেখ, নামায পড়া আল্লাহপাকের হুকুম। নামায না পড়ার নির্দিষ্ট ওজর ছাড়া কোনো কারণেই নামায পরিত্যাগ করা উচিত না। হাদিসে আছে, রসুল (দঃ) বলিয়াছেন– "নামায মুসলমান ও বিধর্মীদের মধ্যে পার্থক্যের হাতিয়ার।" বেনামাযী সম্বন্ধে আরওএমন কথা হাদিসে উল্লেখ আছে, যা শুনলে তোমরা চমকে উঠবে। সময় মতো অন্য দিন বলব, এবার আসি।

ইশিতা বলল, কাল থেকে পড়াতে আসবার কথা মনে থাকবে তো স্যার?

থাকবে।

স্যার, আপনার কাছে আপার বিরুদ্ধে দুটো নালিশ আছে। সেগুলোর সুবিচার করে তবে যাবেন।

বিলকিস ছোট বোনের কথা শুনে বেশ অবাক হয়ে বলল, আমি আবার কবে তোর কাছে কি দোষ করলাম?

ইশিতা বলল, কেউ কি নিজের দোষ দেখতে পায়?

বিলকিস কিছু বলার আগেই হাফিজ বলল, তোমার কথাটা ঠিক। বল, তোমার আপা কি করেছে?

ইশিতা বলল, প্রথমটা হল– আপনার সঙ্গে যেদিন গুলশান সুপার মার্কেটের পার্কে দেখা হল, সেদিন আপনাকে সাথে করে নিয়ে আসিনি বলে প্রথমে রাগারাগি করে। পরে আপনার ঠিকানা জেনে নিইনি বলে বুদ্ধু বলে গালি দিয়েছে। আর দ্বিতীয়টা হল, আজ যখন আপনার কাছে গেল তখন আমিও যেতে চেয়েছিলাম; কিন্তু নিয়ে যাইনি।

ইশিতার কথা শুনে বিলকিস যেমন লজ্জা পেল তেমনি একটু রেগে গিয়ে বলল, তুই যত বড় হচ্ছিস তত ডেঁপো হয়ে যাচ্ছিস। তোকে শাসন করা দরকার।

ইশিতা হাফিজের দিকে তাকিয়ে বলল, দেখলেন তো স্যার, আপনার সামনেই আমাকে ডেঁপো বলল। আপনিই বলুন, কি ডেঁপোমি করলাম?

হাফিজ বুঝতে পারল, ইশিতা বড় বোনের প্রেম কাহিনী জানে। হাসিমুখে তাকে বলল, তুমি একটু আগে বললে না, কেউ নিজের দোষ দেখতে পায় না। তবে তোমার

আপা এখন যে কথা বলল, সেটা ছাড়া আগের দুটো কাজ দোষের করেছে। সে জন্যে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়।

ইশিতা বলল, তা হলে বিচার করে রায় দিন।

হাফিজ বলল, আমি শিক্ষক, তুমি ছাত্রী; আর ও তোমার বড় বোন হিসাবে সম্মানিয়া। তাই আমার পক্ষে তার বিচার করা সম্ভব নয়। তবে একটা পরামর্শ দিতে পারি।

ইশিতা বলল, ঠিক আছে, তাই দিন।

হাফিজ বলল, আমি চলে যাওয়ার পর তোমারা দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে আদর বিনিময় করে কেসটার মীমাংসা করে নিতে পার। আমার মনে হয় এর থেকে আর কোনো সুবিচার হতে পারে না।

হাফিজের কথা শুনে ও তার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে নির্বাক হয়ে দু'বোন দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ইশিতা বলল, উঃ কি দারুণ বিচার করার ক্ষমতা আপনার! যার কোনো তুলনাই হয় না।

হাফিজ বলল, কারো সামনে তার প্রশংসা করতে নেই।

ইশিতা বলল, আর করব না স্যার, আমার ভুল হয়ে গেছে।

শাফিয়া বেগম হাফিজ এতক্ষণ রয়েছে জেনে আয়ার হাতে আবার চা-নাশতা পাঠালেন। হাফিজ চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে সেই সময় আয়াকে চা-নাশতা নিয়ে ঢুকতে দেখে বলল, আবার এসব কেন?

আয়া টেবিলের উপর সেগুলো রেখে বলল, আম্মা পাঠালেন। তারপর সে চলে গেল।

হাফিজ বিলকিসের দিকে তাকিয়ে বলল, শুধু এক কাপ চা খেতে পারি। বিলকিস এক কাপ চা বানিয়ে তার হাতে দিল।

হাফিজ বলল, তোমরা খাবে না?

বিলকিস বলল, খাব। তারপর দু'কাপ চা বানিয়ে ইশিতাকে দিয়ে নিজেও নিল।

ইশিতা চা খেয়ে কাপটা রেখে বলল, আমি যাই। আপনি আপার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যান। কথাটা বলে সে ছুটে বেরিয়ে গেল।

হাফিজ হেসে উঠে বলল, ও তো দেখছি আমাদের ব্যাপারটা আমাদের চেয়ে বেশি ফিল করছে।

বিলকিসও হেসে উঠে বলল, ঠিক তাই। একেক সময় এমন কথা বলে, যা শুনে আমার মনে হয়, তোমাকে ভালোবেসে আমি যতটা না খুশি, ও সে কথা জেনে তার চেয়ে অনেক বেশি খুশি।

হাফিজ বলল, আমরাও তাই মনে হচ্ছে। সহজ সরল মেয়েরা ঐ রকম হয়ে থাকে। আসি, আল্লাহ হাফেজ বলে সালাম বিনিময় করে চলে গেল।

হাফিজ অফিস থেকে ফিরে প্রতিদিন ইশিতাকে পড়াতে আসে। বিলকিস মা ও ভাইয়ের অগোচরে প্রায়ই তার সঙ্গে দেখা করে। অবশ্য ইশিতাই সুযোগ করে দেয়। মাস তিনেক পর এক ছুটির দিনে বিলকিস হাফিজের সঙ্গে জয়দেবপুর বেড়াতে এল। অফিস বন্ধ ছিল বলে অফিসের বাইরের চারদিক ঘুরে একটা নিরিবিলি গাছের তলায় বসে গল্প করতে লাগল। এক সময় বিলকিস বলল, তুমি আর কত দেরি করবে?

হাফিজ ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে বলল, মাস কয়েকের মধ্যে আমার প্রমোশন হবার চান্স আছে। সেটা হয়ে গেলে আর দেরি করব না। এর মধ্যে একবার দেশ থেকে ঘুরে আসার ইচ্ছা করেছি।

বিলকিস বলল, যা করার তাড়াতাড়ি কর। এভাবে গোপনে তোমার সঙ্গে বেরিয়ে মনে শান্তি পাচ্ছি না। তা ছাড়া তোমাকে ছেড়ে থাকতেও আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

হাফিজ বলল, আমাকে একটু গুছাতে দাও। প্রমোশন হলে কোম্পানির কোয়ার্টার পাব। তার আগে তোমাকে তো আর ঐ চাচাতো ভাইয়ের বাসায় তুলতে পারব না। তুমি কি তোমাদের ফ্যামিলির মতামতের ব্যাপারে কিছু চিন্তা-ভাবনা করেছ? আমার তো মনে হয় ওনারা কেউ রাজি হবে না।

বিলকিস বলল, তা আমিও জানি। তবে বাবাকে ম্যানেজ করতে পারব বলে মনে হয়। তাদের মতামত পাই আর না পাই, আমি আমার সংকল্প থেকে একচুল নড়বো না। তাতে আমার ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক। তুমি কি ভয় পাচ্ছ?

পাচ্ছি। তবে নিজের জন্য নয়, তোমার জন্য। তুমি যদি চাও তা হলে আমি প্রস্তাব দেব।

বিলকিস আতঙ্কিত স্বরে বলল, না না, তা তোমাকে দিতে হবে না। যা কিছু করার আমি করব। চল, এবার ফেরা যাক।

অফিস ছুটি থাকায় হাসান আজ সারাদিন বাসাতে ছিল। নাশতা খাওয়ার পর থেকে বিলকিসকে দেখতে না পেয়ে হাসান ইশিতাকে জিজ্ঞেস করল, বিলকিস কোথাও গেছে নাকি? তাকে দেখছি না কেন?

ইশিতা জানে আপা কোথায় গেছে। যাওয়ার সময় মাকে বান্ধবীর বাসায় বেড়াতে যাওয়ার কথা বললেও তাকে সত্য কথা বলে গেছে। তাই একটু ঘাবড়ে গিয়ে আমতা আমতা করে বলল, তা তো জানি না। দাঁড়াও, মাকে জিজ্ঞেস করে আসি। একটু পরে মাকে জিজ্ঞেস করে এসে বলল, আপা তার এক বান্ধবীর বাসায় বেড়াতে গেছে।

হাসান বলল, ওর বান্ধবীকে চিনিস?

ওর তো অনেক বান্ধবী, কার বাসায় গেছে কি করে জানব।

ঠিক আছে, তুই যা। ও ফিরলে আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে বলিস।

সেদিন বিলকিস দুপুরে হাফিজের সঙ্গে হোটেলে খেয়ে ফেরার পথে চিড়িয়াখানা দেখে বিকেলে বাসায় ফিরল।

ইশিতা তাকে বলল, ভাইয়া দুপুরে আমাকে ডেকে তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল। তারপর ভাইয়ার সঙ্গে তার যে সমস্ত কথাবার্তা হয়েছিল সব বলে বলল, তোমাকে ভাইয়া দেখা করতে বলেছে।

বিলকিস শুনে একটু ভয় পেল। জিজ্ঞেস করল, ভাইয়া কি কিছু জানতে পেরেছে?

ইশিতা বলল, আমার সেকথা মনে হয় না। অন্য কোনো ব্যাপারে হয়ত দেখা করতে বলেছে।

বিকেলে সকলের সঙ্গে চা খাওয়ার সময় বিলকিস ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করল, তুমি নাকি আমাকে খোঁজ করেছিলে?

হাসান বলল, হ্যাঁ। তোকে তো প্রায় প্রত্যেক ছুটির দিন বাসায় পাওয়া যায় না। বান্ধবীদের বাসায় এত যাস কেন? কই, তারা তো তোর বাসায় আসে না। যাই হোক, সামনের শুক্রবারে কোথাও যাবি না। ঐদিন পাত্র তার বন্ধুদের নিয়ে দেখতে আসবে।

কথাটা শুনে বিলকিসের বুকটা ধক করে উঠল। কোনো কথা না বলে চা খাওয়া হয়ে যেতে সেখান থেকে নিজের রুমে চলে গেল।

দু'বোন এক রুমে দু'টো খাটে ঘুমায়। রাতে ঘুমোবার সময় ইশিতা বলল, আপা এবার কি করবে?

বিলকিস বলল, চিন্তা করে দেখি কি করা যায়।

এতদিন তা হলে কোনো চিন্তা করনি?

চিন্তা যে একদম করিনি তা নয়। সেই জন্যে হাফিজকে বিয়ের ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়েছিলাম। শুনে সে কয়েক মাস সময় চেয়েছে।

ভাইয়ার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তার আগেই সে তোমার বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে।

তা আমিও বুঝতে পেরেছি। তবে ভাইয়া জোর করে আমার বিয়ে দিতে পারবে না, একথা আমিও জোর করে বলতে পারি।

আমি একটা কথা বলছি আপা, ভাইয়া কিছু করার আগে তুমি বাবাকে তোমার ও স্যারের ব্যাপারটা জানাও। বাবা তোমাকে আমাদের সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসে। শুনে প্রথমে রেগে গেলেও শেষ মেস রাজি হয়ে যেতে পারে।

বিকেলে ভাইয়ার কথা শোনার পর থেকে বিলকিসের মন খারাপ হয়ে ছিল। ইশিতার কথা শুনে হেসে ফেলল। বলল, আমার ব্যাপারটা আমি দেখব, তুই এত ইন্টারফেয়ার করছিস কেন? কিরে তুইও কাউকে ভালোবাসিস নাকি?

আপার কথা শুনে ইশিতা মনে আঘাত পেল। তার চোখে পানি এসে গেল। কথা না বলে চুপ করে রইল।

তাকে চুপ করে থাকেতে দেখে বিলকিস বলল, কিরে কিছু বলছিস না কেন?

ইশিতা এবার ফুঁপিয়ে উঠল।

বিলকিস তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে তার কাছে গিয়ে পাশে বসে বলল, কি হল, কাঁদছিস কেন?

ইশিতা আপাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি ঐ কথা বলতে পারলে? জান, যাকে আমি সব থেকে বেশি ভালোবাসি সে ছেলে নয়, মেয়ে। আর সেই মেয়েটা তুমি। তুমি কোনো কারণে দুঃখ পেলে আমি তা সহ্য করতে পারব না।

তারপর সে আপার বুকে মুখ গুঁজে আবার ফুঁপিয়ে উঠল।

বিলকিস ভাবতেই পারে নি, ইশিতা তাকে এত ভালোবাসে! নিজের আঁচলে তার চোখ-মুখ মুখে দেয়ার সময় বলল, ঐ কথা বলে তোর সাথে একটু রসিকতা করছিলাম। আর তুই কিনা সত্যি মনে করলি! তুই আমাকে কত ভালোবাসিস, তা কি আমি জানি না। তবু কথাটা বলে আমি ভুল করেছি। আমাকে মাফ করে দে।

ইশিতা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, না আপা, তুমি ভুল করনি, বরং আমিই তোমার কথার অর্থ অন্যভাবে নিয়ে ভুল করেছি।

বিলকিস তার কপালে একটা চুমো খেয়ে বলল, নে, এবার শুয়ে পড়ে। তোর কথাই ঠিক, ভাইয়া পাকাপাকি কিছু করার আগে বাবাকে সবকিছু জানিয়ে ম্যানেজ করার চেষ্টা করতে হবে।

পরের শুক্রবারে পাত্র তিন-চারজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বিলকিসকে দেখতে এল।

শাফিয়া বেগম মেয়েকে সে কথা জানিয়ে ভালো জামা-কাপড় পরতে বললেন।

বিলকিস বলল, আমি কি দোকানের শো-কেসের জিনিস যে আসবে তাকেই দেখাতে হবে? আমি ওদের কাছে যেতে পারব না।

শাফিয়া বেগম তাকে অনেক বুঝিয়ে রাজি করাতে না পেরে রাগারাগি করলেন।

বিলকিস নিজের গঁয়ে অটল থাকল।

রকিব সাহেব তাদের সঙ্গে সালাম বিনিময় ও পরিচয়াদির পর নিজের রুমে চলে গেছেন।

হাসান এতক্ষণ মেহমানদের আপ্যানের কাজে ব্যস্ত ছিল। তারা আসার পর হাসান মাকে বলেছিল, তুমি বিলকিসকে সাজিয়ে ওদের কাছে পাঠিয়ে দিও। বিলকিস আসছে না দেখে মায়ের কাছে যখন এল তখন শাফিয়া বেগম মেয়ের সাথে রাগারাগি করছেন। হাসান ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বিলকিসকে বলল, তোর মতলব কি বল তো?

বিলকিস মাথা নিচু করে বলল, আমি তো সেদিন বাবাকে বলেছি। এখন বিয়ে করব না, এম.এ. পড়ব।

হাসান বলল, সে কথা বাবা আমাকে বলেছে। আমি ছেলেকে সে কথা জানাতে বলল, সে তো খুব ভালো কথা। পড়তে চাইলে আমাদের তরফ থেকে কোনো বাধা আসবে না।

বিলকিস বলল, তবু এখন আমি বিয়ে করব না।

হাসান রেগে গিয়ে বলল, কেন করবি না তোকে বলতে হবে।

রকিব সাহেব হাসানের গলার শব্দ পেয়ে সেখান এসে বললেন, কি ব্যাপার?

হাসান বলল, বিলকিস ওদের কাছে যেতে চাচ্ছে না। বলছে এখন বিয়ে করবে না।

রকিব সাহেব গম্ভীর স্বরে মেয়েকে বললেন, কেউ দেখতে এলেই তার সঙ্গে যে বিয়ে হবে একথা ঠিক নয়। যাও, ড্রেস চেঞ্জ করে ওদের কাছে যাও।

বিলকিস আর কিছু না বলে ড্রেস চেঞ্জ করে ভাইয়ার সঙ্গে ড্রইংরুমে এসে সালাম জানাল।

পাত্রের বন্ধুরা সালামের উত্তর দিয়ে বসতে বলল।

বিলকিস রুমে ঢুকে সবার দিকে একবার চোখ বুলোতে গিয়ে সুমনকে দেখে মনে মনে চমকে উঠে মাথা নিচু করে বসে চিন্তা করল, সুমন পাত্র নয় তো? তখন তার সমুনের অনেক কথা মনে পড়ল। বান্ধবী তন্নীর বড় ভাইয়ের বৌভাত খেতে গিয়ে সুমনের সঙ্গে পরিচয় হয়। সে তন্নীর বড় ভাইয়ের বন্ধু। সেদিন পরিচয় হওয়ার পর এক সময় তাকে একা পেয়ে সুমন বলেছিল, তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে আমি দেখিনি। তোমাকে আমার খুব ভালো গেলেছে। আমাকে তোমার কেমন মনে হয়?

বিলকিস বিরক্ত হয়ে বলেছিল, আপনিও কম কিসে। তারপর তার কাছ থেকে চলে আসে। এরপর সুমন অনেক দিন তার পিছনে লেগেছিল। ছুটির সময় কলেজের গেটে এসে অপেক্ষা করত। দেখা হলে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলত। চাইনিজ খাওয়াবার লোভ দেখাত। বিলকিস খুব বিরক্ত বোধ করলেও সৌজন্য রক্ষার জন্য তার সঙ্গে শুধু কথা বলত। কিন্তু কোনোদিন তার কোনো অফার গ্রহণ করেনি। তন্নীর কাছে সুমনের সব কথা বিলকিস শুনেছে। সে বড়লোকের শিক্ষিত ছেলে। ভালো চাকরি করে। সুমন দেখতে বেশ সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান। যে কোনো মেয়ে তাকে পেলে ধন্য হয়ে যাবে। কিন্তু তবু কেন কি জানি বিলকিস তাকে সহ্য করতে পারত না। তাকে দেখলেই বিরক্তিতে তার মন ভরে যেত। তাই যেদিন সুমন তাকে বলল, তোমাকে আমি ভালোবাসি, সেদিন বিলকিস রেগে গিয়ে বলেছিল, ভালোবাসা মুখে বললে হয় না। ওটা মনের ব্যাপার। আমার মনে সে রকম কিছু হয়নি। আর ওসব ব্যাপার নিয়ে আমি কোনোদিন মাথা ঘামাইনি। আপনি এ ব্যপার নিয়ে আর কখনও আমার সঙ্গে আলাপ করবেন না। তাপরও সুমন অনেক দিন তার পিছু ছাড়েনি। শেষে সুবিধে করতে না পেরে সরে গিয়েছিল।

আজ তার বন্ধুদের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে সুমনের দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখল, সে গোঁফের আড়ালে হাসছে।

বন্ধুরা একসময় সুমনকে বলল, কি রে তুই কিছু জিজ্ঞেস করছিস না কেন?

সুমন বলল, আমার কিছু জিজ্ঞেস করার নেই। তোদের আরও কিছু করার থাকলে কর।

বন্ধুরা আরও দু'চারটে প্রশ্ন করার পর সকলে বিদায় নিয়ে চলে গেল। সুমন বাসায় এসে তার পছন্দের কথা মাকে জানিয়ে বলল, তোমরা বিয়ের ব্যবস্থা করতে পার।

সুমনরা চলে যাওয়ার পর সুমনই পাত্র বুঝতে পেরে বিলকিস নিজের রুমে এসে চিন্তা করল, তাকে বিয়ে করার জন্য নিশ্চয় খুব উঠে-পড়ে লাগবে। আর মা, বাবা ও ভাইয়া এমন সুযোগ ছাড়বে না। কারণ পাত্র হিসেবে সুমন যে সব দিক থেকে ভালো তা নিঃসন্দেহ। ভেবে রাখল, আজ রাতে বাবাকে নিজের মতামত জানাবে।

রাতে ঘুমোবার আগে বিলকিস বাবার রুমে গেল।

রকিব সাহেব তখন ঘুমাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। বিলকিসকে দেখে বললেন, কিরে, কিছু বলবি? আয়, আমার পাশে এসে বস।

বিলকিস বাবার পাশে বসে তার একটা হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, আমি হাফিজকে ভালোবাসি। তাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারব না। তারপর সে চুপ করে মাথা নিচু করে রইল।

রকিব সাহেব অনেক আগে মেয়ের মনের কথা একটু আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। তখন ভেবেছিলেন, হাফিজ ভালো ছেলে বলে হয়ত তার মনে একটু দাগ কাটতে পারে। তাই বলে একটা রংমিস্ত্রিকে ভালোবেসে বিয়ে করতে চাইবে, এতটা তিনি আশা করেননি। এখন মেয়ের কথা শুনে নিজের আভিজ্যাত্যের কথা ভেবে খুব রেগে গেলেন। কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না।

বিলকিস সাহস করে বলে ফেললেও ভয়ে তার বুক ঢিবঢিব করছিল। বাবাকে চুপ করে থাকতে দেখে তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে গম্ভীর মুখ দেখে আবার মাথা নিচু করে নিল।

বেশ কিছুক্ষণ পর রকিব সাহেব ভারী গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তার সব খবর তুই কি জানিস?

জানি।

একটা রংমিস্ত্রিকে ভালোবাসতে তোর রুচিতে বাধল না? আমাদের আভিজাত্যের কথা একটু চিন্তা করলি না? আমরা সোসাইটিতে মুখ দেখাব কি করে? আর তুই তার কি পরিচয় দিবি? এসব কথা ভেবে দেখেছিস?

বাবা, আমি সব কিছু ভেবে দেখেছি। আমার বিবেক ঐসব কথা বলে আমাকে সাবধানও করছে। কিন্তু হাফিজের ব্যক্তিত্ব, তার আদর্শ এবং তার চরিত্রের পবিত্রতার কাছে তোমাদের আভিজাত্যের মিথ্যে অহঙ্কার, তোমাদের সোসাইটির মেকি সভ্যতার খোলস তৃণ খণ্ডের মত উড়ে গেছে। হাফিজের উচ্চ বংশ পরিচয় নেই। তার বাবা রংমিস্ত্রি ছিল। সেও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুদিন সেই কাজ করেছে। তাতে করে তোমাদের সোসাইটিতে তার কোনো ইজ্জত না থাকতে পারে, কিন্তু সারা পৃথিবীর মানব সোসাইটিতে তার ইতিহাস চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। দুনিয়ার শিক্ষিত বেকারদেরকে সে জানিয়ে দিয়েছে, বেকার থাকার চেয়ে সৎভাবে যে কোনো কাজ করে এগিয়ে যাওয়া অনেক ভালো। পৃথিবীতে কোনো কাজই অপমানজনক নয়। বরং শিক্ষিত হয়ে কোনো কাজকে ছোট মনে করার অর্থ, শিক্ষাকে অপমান করা।

রকিব সাহেব মেয়েকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোর কথা ঠিক। তবে সেগুলো শুধু সাহিত্য, নভেলে ও নাটকে দেখা যায়। বাস্তবে এগুলোর যে কোনো সম্পর্ক নেই তা তুইও জানিস।

বিলকিস বলল, আমিও তাই জানতাম বাবা। কিন্তু হাফিজকে দেখে আমার সে ধারণা বদলে গেছে।

রকিব সাহেব বললেন, তুই যে সিদ্ধান্তের কথা বললি, তার পরিণতির কথা চিন্তা করেছিস?

পরিণতির কথা ভেবে কি করব। ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। মানুষ তো ভাগ্যের হাতের পুতুল। তুমি সে কথা অস্বীকার করতে পারবে?

না, তা পারব না। তুই ছেলেমানুষ। সংসারের বাস্তবতা সম্বন্ধে তোর কোনো জ্ঞান নেই। তাই ভাগ্যের কথা বলে নিজেকে ও আমাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছিস। কিন্তু বাস্তব যে কত কঠিন জিনিস তা জানিস না। অল্প জ্ঞানের দ্বারা আবেগের বশবর্তী হয়ে যে স্বপ্ন তুই দেখছিস, বাস্তব জীবনে প্রবেশ করে তার নাম গন্ধও পাবি না। তখন যেমন দুঃখ পাবি তেমনি অনুশোচনায় দগ্ধ হবি। সেই সব দেখে শুনে আমাদের মনের অবস্থা কি হবে ভেবে দেখ। শেষের কথাগুলো বলার সময় ওনার চোখে পানি এসে গেল।

বিলকিস তাই দেখে বলল, বাবা, তুমি আমার জন্যে অত চিন্তা করো না। আমি নেহাত ছোট নই। লেখাপড়াও করছি। ভালোমন্দ বোঝার জ্ঞান আমার হয়েছে। তবু যদি আমি কিছু ভুল করে থাকি, তা হলে তা সংশোধন করার মতো জ্ঞান ও সৎসাহস আমার আছে। তারপর সে চুপ করে গেল।

রকিব সাহেব কিছু বলার আগেই হাসান ঘরে ঢুকল। তার সাথে শাফিয়া বেগম ও ইশিতা ঢুকল। বিলকিস বাবার কাছে যাওয়ার সময় ইশিতাকে বলেছিল। সে তার পিছে পিছে এসে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। ইশিতা জানে ভাইয়া আপার মতামত জানতে পারলে খুব হৈচৈ করবে। স্যারের সঙ্গে আপার বিয়ে কিছুতেই দিবে না। তাই আপাকে বাবার কাছে সব কথা বলতে শুনে ভাইয়াকে গিয়ে বলল, আপার এ বিয়েতে মত নেই। সে নাকি একটা ছেলেকে ভালোবাসে। আপা সে কথা বাবাকে জানাতে গেছে। হাসান কথাটা শুনে বাবার রুমের কাছে এসে বাইরে থেকে তাদের কথা শুনতে লাগল।

ইশিতা মায়ের কাছে গিয়ে ঐ একই কথা বলে তাকে সাথে করে নিয়ে এসে ভাইয়ার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

বিলকিসের কথা শেষ হতেই হাসান ঘরে ঢুকে রাগে ফেটে পড়ল– বাবা, তোমাদের সব কথা আমি শুনেছি। বিলকিসের ব্যাপারটা তুমি মেনে নিলেও আমি পারব না। একটা রংমিস্ত্রির ছেলে, যে নাকি কিছু দিন আগে পর্যন্ত রংমিস্ত্রি ছিল, তার হাতে বিলকিসকে আমরা কিছুতেই দিতে পারব না। তারপর বিলকিসকে উদ্দেশ্য করে বলল, তুই একটা গ্রাজুয়েট মেয়ে হয়ে এমন কাজ করতে পারলি? তোর রুচি বলে কি কিছুই নেই। ছিঃ ছিঃ! তোকে আমার বোন বলতে ঘৃণা বোধ হচ্ছে। শোন, এখনও সময় আছে, হাফিজের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দে। তারপর আমি হাফিজকে ম্যানেজ করব। তোকে সহজ সরল দেখে নিজের পরিচয় ভুলে অর্থ ও সোনা দানার লোভে বড়লোকের মেয়েকে ভুলিয়ে ভালোবাসার ফাঁদে ফেলেছে। তাকে জব্দ করার কৌশল আমার জানা আছে। তোকে সাবধান করে দিচ্ছি, আর কোনোদিন হাফিজের নাম মুখে আনবি না।

বিলকিস দৃঢ় স্বরে বলল, ভাইয়া তুমি থাম। আমি তোমার কোনো কথা শুনব না। তুমি যে তাকে লোভী বললে তা সে কখনই নয়। তোমরা তাকে শুধু একজন রংমিস্ত্রি বলে জান। তাই ঐ সব বলতে পারলে। তার ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ চরিত্রের কথা জানলে বলতে পারতে না। তোমার বোনকে সরল সহজ ভেবে সে আমাকে ভালোবাসার ফাঁদে

ফেলেনি। বরং সে তার আদর্শ চরিত্রে অটল ছিল। আমিই তার ঐসব গুণে অভিভূত হয়ে দু'বছর ধরে সাধনা করে তাকে জয় করেছি। তোমরা যদি জোর করে আমার অন্য কোথাও বিয়ে দাও, তা হলে সে তার ব্যক্তিত্বের গুণে দুঃখ সইতে পারলেও আমি পারব না, বিষ খেয়ে দুঃখের অবসান ঘটাব।

বিলকিসের কথার উত্তর দিতে না পেরে হাসানের যত রাগ সব বাবার উপর গিয়ে পড়ল। বলল, বাবা, তোমার আস্কারা পেয়ে পেয়ে বিলকিসের চরিত্রের এত অবনতি ঘটেছে। সামান্য একটা রংমিস্ত্রির জন্যে বিষ খাবে বলে আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছে। আমিও তোমাকে বলে রাখছি, বিলকিস যদি তার মতের উপর অটল থাকে, তবে আমিও আমার মতের উপর অটল থাকব। দেখব সেই ইতর কুকুরটা কেমন করে আমার বোনকে বিয়ে করে। তারপর সে ঝড়ের বেগে ঘরে থেকে বেরিয়ে গেল।

হাসান চলে যাওয়ার পর ঘরের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। প্রথমে রকিব সাহেব নিস্তব্ধ ভঙ্গ করে বললেন, তোমরা এখন যাও, আমি ঘুমাব।

বিলকিস আগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার পিছনে পিছনে ইশিতাও বেরিয়ে এল। শোবার ঘরে এসে আপাকে মন ভার করে খাটে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কিছু বলার জন্য তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু কিছু বলতে সাহস করল না।

কিছুক্ষণ পর বিলকিস বলল, কি রে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন? কিছু বলবি?

ইশিতা কি বলবে এতক্ষণ ভেবেও কিছু ঠিক করতে পারেনি। তাই শুধু না সূচক মাথা নাড়ল।

বিলকিস বলল, তা হলে এভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে ঘুমিয়ে পড়।

ইশিতা চুপচাপ এসে নিজের খাটে শুয়ে পড়ল, কিন্তু আপার চিন্তায় তার ঘুম এল না।

বিলকিস আরও কিছুক্ষণ ঐভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বাথরুমে গিয়ে চোখ-মুখ ধুয়ে এসে ইশিতার নাম ধরে ডেকে বলল, কিরে, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?

না আপা, কিছু বলবে?

কি আর বলব, এবার ঘুমিয়ে পড়।

ঘুম যে আসছে না।

আমার কথা ভেবে তোর খুব ভয় করছে না?

করছে। এবার কি করবে ভেবেছ?

যা ভাববার আগেই ভেবে রেখেছি। নতুন করে ভাববার কিছু নেই।

ভাইয়া রেগে গেছে, মনে হয় স্যারকে খুব অপমান করবে।

তা করতে পারে। তবে তার আগে তাকে আমি সবকিছু জানিয়ে সাবধান করে দেব। তুই আমাদের ব্যাপারে মাথা গলাবি না। ভাইয়া জানতে পারলে তোর ওপরও খুব রেগে যাবে। নে, এবার ঘুমোবার চেষ্টা কর। অনেক রাত হল।

ইশিতার ফাইন্যাল পরীক্ষা কয়েকদিন আগে শেষ হয়েছে। তাই হাফিজ আর তাকে পড়াতে আসেনি। ফলে এই সমস্ত ঘটনা সে জানতে পারল না।

বিলকিস ঘটনাটা জানাবার জন্যে পরের দিন বিকেলে একটা বেবীতে করে হাফিজের বাসায় এল। কিন্তু তাকে পেল না। সে তখনও অফিস থেকে ফিরেনি।

বিলকিস ঘণ্টা দুই অপেক্ষা করে ফিরে আসার সময় মাসুদা ভাবিকে বলে এল, হাফিজকে বলবেন, আমি কাল আবার আসব। সে যেন আমাদের বাসায় না যায়। আর ফোনও যেন না করে।

আজ অফিসে মিটিং থাকায় হাফিজকে রাত আটটা পর্যন্ত থাকতে হল। সাড়ে ন'টার সময় বাসায় ফিরল। ভাত খাওয়ার সময় মাসুদা তাকে বিলকিসের কথা জানাল।

হাফিজ কোনো কথা না বলে খাওয়া শেষ করল। তারপর শোবার সময় চিন্তা করল, দু'দিন আগে তো দু'জনে বেড়ালাম, এর মধ্যে নিশ্চয় কিছু হয়েছে। নচেৎ আজ এসে না পেয়ে আবার কাল আসবে বলেছে কেন? তাদের বাসাতে যেতেও নিষেধ করল কেন? তা হলে কি আমাদের ব্যাপারটা বাসায় জানাজানি হয়ে কোনো গোলমাল হয়েছে?

পরদিন অফিস ছুটির পর তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে বিলকিসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু বিলকিস এল না। হাফিজ ভাবল, হয়ত কোনো কারণে আজ আসতে পারেনি, কাল নিশ্চয় আসবে। যখন তিন দিন পার হয়ে গেল অথচ বিলকিসে এল না তখন হাফিজের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। বিলকিসের নিষেধ সত্ত্বেও মাগরিবের নামায পড়ে তাদের বাসায় রওয়ানা দিল।

ঐ ঘটনার দু'দিন পর রকিব সাহেবকে বিজনেসের ব্যাপারে জাপান যেতে হল। যাওয়ার আগে হাসানকে বলে গেলেন, তুমি বিলকিসের ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামিও না। আমি জাপান থেকে ফিরে এসে যা করার করব।

হাসান বাবাকে মুখে কিছু বলল না বটে কিন্তু মনে মনে একটা প্ল্যান ঠিক করে ফেলল। বাবা চলে যাওয়ার পর বিলকিস যাতে হাফিজের সাথে দেখা করতে না পারে সে জন্যে তাকে বলল, বাবা ফিরে না আসা পর্যন্ত তুই কোথাও যাবি না।

বিলকিস ভাইয়ার মুখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে বলল, কেন?

বাবার হুমুক।

বাবা এ রকম হুকুম করতেই পারে না। এটা তোমার কথা।

তাই যদি ভাবিস, তা হলে তাই। কথাটা মনে রাখবি। তারপর সে চলে গেল।

বিলকিস কিন্তু তার কথা শুনল না। বিকেলে হাফিজের সঙ্গে দেখা করতে যাবে বলে গেটের কাছে বেরিয়েছে, ঠিক সেই সময় হাসান বাসায় ফিরছিল। একেবারে ভাইয়ার সামনে পড়ে গেল।

হাসান রাগের সঙ্গে বলল, তোকে সকালে নিষেধ করে গেলাম, তবু বেরোচ্ছিস? তোর সাহস তো কম না? চল, ভিতরে চল।

বিলকিস দৃঢ় স্বরে বলল, না। আমাকে এক জায়গায় যেতেই হবে।

হাসান আরওরেগে গিয়ে বলল, আমার মুখের ওপর কথা বলছিস? কোথায় যাবি শুনি?

বিলকিস বলল, হাফিজের কাছে।

হাসান রাগ সামলাতে পারল না। তার গালে ঠাস করে একটা চড় মেরে গর্জে উঠল। সেই ইতরটার নাম আমার সামনে বলতে তোর লজ্জা করল না?

বিলকিস কল্পনাও করতে পারেনি ভাইয়া তাকে মারবে। ফুঁপিয়ে উঠে ছুটে ফিরে এসে নিজের রুমে গিয়ে বিছানায় শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ইশিতা দুষ্টুমি করলে হাসান কখনও-সখনও তার গায়ে হাত তুললেও বিলকিস শান্তশিষ্ট বলে তার গায়ে কখনও হাত তুলেনি। আজ তার গায়ে হাত তুলে মনে একটু অনুশোচনা হলেও রেগে ছিল বলে সেটা পাত্তা না দিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে বলল, বিলকিস যেন বাইরে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখ। কয়েকদিনের মধ্যে আমি ওর বিয়ে দিয়ে দেব।

শাফিয়া বেগম বিলকিসের কীর্তিকলাপে তার প্রতি খুব অসন্তুষ্ট। তবু ছেলের কথা মেনে নিতে পারলেন না। বললেন, তা কি করে হয়? তোর বাবা ফিরুক, তারপর যা করার করবি। তোর বাবা যাওয়ার আগেও সে কথা তোকে বলে গেছে।

হাসান বলল, তা বলেছে। কিন্তু বাবার কি ইচ্ছা তা আমার বুঝতে বাকি নেই। তাই সে ফেরার আগে আমি ওর বিয়ে দিতে চাই।

শাফিয়া বেগম বললেন, না, তা হতে পারে না। তোর বাবা খুব দুঃখ পাবে।

হাসান বলল, আমি বাবাকে ম্যানেজ করব। তুমি শুধু বিলকিসকে বাইরে কোথাও যেতে দিও না। কথা শেষ করে সে মায়ের কাছ থেকে চলে গেল।

ইশিতা ভাইয়াকে আপার গায়ে হাত তুলতে দেখেছে, তারপর মায়ের সঙ্গে ভাইয়ার যা কথাবার্তা হয়েছে, তাও শুনেছে। ভাইয়া নিজের রুমে চলে যাওয়ার পর মায়ের কাছে এসে বলল, আপা বাইরে যাচ্ছিল বলে ভাইয়া তার গালে চড় মেরেছে।

শাফিয়া বেগম খুব অবাক হয়ে বললেন, তাই নাকি?

ইশিতা বলল, হ্যাঁ মা, আমি তখন বারান্দায় ছিলাম।

শাফিয়া বেগম গম্ভীর হয়ে বললেন, ঠিক আছে, তুই এখন যা।

ইশিতা আপার কাছে এসে তাকে কাঁদতে দেখে বলল, কান্না থামিয়ে এখন চিন্তা কর কি করবে। তারপর ভাইয়া ও মায়ের মধ্যে যে সব কথাবার্তা হয়েছে তা বলল।

শুনে বিলকিস গুম হয়ে বসে রইল।

ইশিতা তাকে ঐভাবে বসে থাকতে দেখে বলল, আপা, তুমি কিছু বলছ না কেন? আমার কেমন যেন ভয় করছে।

বিলকিস ম্লান হেসে বলল, ভয়ের কি আছে! আমাকে নিয়ে তুই অত ভাববি না।

ঐদিন সন্ধে সাড়ে সাতটার সময় হাফিজ বিলকিসদের বাসায় এল।

হাসান ড্রইংরুমে বসে প্রতিবেশী এক বন্ধুর সাথে কথা বলছিল।

হাফিজ ঢুকে সালাম দিয়ে হাসানকে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন?

হাফিজকে দেখে রাগে হাসানের পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল। কয়েক সেকেণ্ড কোনো কথা বলতে পারল না। বন্ধুটা না থাকলে ফেটে পড়ত। কোনো রকমে সামলে নিয়ে হাফিজের সালামের ও কথার উত্তর না দিয়ে বন্ধুকে বলল, তুমি এখন যাও। আমি এই লোকের সঙ্গে একটু আলাপ করব।

বন্ধুটা সালাম বিনিময় করে চলে যাওয়ার পর হাসান গম্ভীর স্বরে বলল, আপনি আবার কেন এসেছেন? ইশিতার তো পরীক্ষা হয়ে গেছে। বেতনের টাকার জন্যে এসেছেন বুঝি? তারপর চিৎকার করে বলল, এই– কে আছিস, এদিকে আয়।

হাফিজ হাসানের ব্যবহারে খুব একটা অবাক হল না। আসার সময় এরকম কিছু-একটা আশা করছিল। বলল, আমি বেতনের জন্যে আসিনি।

হাসান এবার রাগে ফেটে পড়ল। বেশ জোর গলায় বল, তা হলে কেন এসেছেন? ছিঃ ছিঃ! আপনি এত নীচ, তা আমরা ভাবতেই পারিনি। এক্ষুনি চলে যান। আর কোনো দিন আসবেন না। ছোটলোকেরা লেখাপড়া করে শিক্ষিত হতে পারে, কিন্তু কোনো দিন ভদ্র হতে পারে না, সেই ছোটলোকই থেকে যায়। এখনও দাঁড়িয়ে আছেন? চলে যান, নচেৎ ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে বাধ্য হব। বাবা থাকলে এতক্ষণ আপনাকে পুলিশের হাতে তুলে দিত।

হাফিজ বুঝতে পারল, তার ও বিলকিসের ব্যাপারটা জেনে হাসান এই রকম করছে। খুব অপমান বোধ করলেও তেমন গায়ে মাখল না। বলল, থাকার জন্যে তো আসিনি, চলেই যাব। তবে তার আগে বিলকিসের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

স্কাউণ্ড্রেল বলে হাসান দাঁড়িয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, সে আপনার সঙ্গে আর কোনো দিন দেখা করবে না। তার ভুল সে বুঝতে পেরেছে। আমরা তার কথামতো বিয়ের ব্যবস্থা করেছি। এবার চলে যান। নচেৎ কিছু অঘটন ঘটিয়ে ফেলবে।

এই কথা শুনে হাফিজ ভাবল, হাসান যা রেগে গেছে, অঘটন কিছু ঘটাতে তার বিবেকে বাধবে না। বলল, ঠিক আছে, চলে যাচ্ছি। তবে কাজটা আপনি ভালো করলেন না। তারপর সে হন হন করে বেরিয়ে গেল।

ইশিতা ভাইয়ার চিৎকার শুনে নিজের রুম থেকে এসে ড্রইংরুমে ঢুকতে গিয়ে স্যারকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তার পরের ঘটনা দেখে শুনে ফিরে গিয়ে প্রথমে আপাকে ও পরে মাকে জানাল।

বিলকিস শুনে চোখের পানি ফেলতে লাগল। আর শাফিয়া বেগম শুনে ছেলের কাছে এসে বেশ রাগের সঙ্গে বললেন, তুই খুব বাড়াবাড়ি করছিস। নিজে শিক্ষিত হয়ে অন্য একজন শিক্ষিত ছেলেকে এভাবে অপমান করে তাড়িয়ে দিলি, এটা কি উচিত হল? মনে রাখা উচিত ছিল, সে দোষ করলেও তোর ছোট বোনের মাস্টার। তাকে ভালোমুখে অন্যভাবে কথাগুলো বলতে পারতিস।

হাসানও রাগের সঙ্গে বলল, বোনের মাস্টার বলে ছাত্রীর বড় বোনের সঙ্গে প্রেম করবে, আর আমি বড় ভাই হয়ে কিছু করব না, বলব না, তা কি করে ভাবলে? যা করেছি ভালোই করেছি। অন্য কেউ হলে মেরে তক্তা বানিয়ে ফেলত তা না হলে পুলিশের হাতে তুলে দিত।

শাফিয়া বেগম বললেন, এত লেখাপড়া করলে কি হবে, তোর বুদ্ধিসুদ্ধি কিছুই হয়নি। তারপর তিনি চলে গেলেন।

সে রাতে বিলকিস কিছু খেল না। সারা রাত কেঁদে কাটাল। ভোরে ফজরের আযানের সময় ইশিতার সাহায্যে বাসা থেকে বেরিয়ে গেল।

রকিব সাহেবের বাসায় যে মেয়েটা আয়ার কাজ করে, তার স্বামী সামসু রিকশা চালায়। বাড়ির পিছন দিকে কিছুটা খালি জায়গা আছে। সেখানে সামসু একটা বেড়ার ঘর করে স্ত্রীকে নিয়ে থাকে। তার স্ত্রী বাঁজা। তাই তাদের কোনো ছেলেমেয়ে নেই।

সামসু ছোটবেলা থেকে বিলকিসকে ও ইশিতাকে স্কুলে ও কলেজে নিয়ে যাওয়া-আসা করছে। রকিব সাহেবই সামসুকে ঘর করে ও রিকশা কিনে দিয়েছেন। সামসু তাদের বাজার-হাট করে দেয়। মেয়েদেরকে নিয়ে যাওয়া-আসা করার জন্য রকিব সাহেব তাকে মাসিক কিছু টাকা দেন।

বিলকিস রাতে এক ফাঁকে সামসুকে বলে রেখেছিল, খুব ভোরে তাকে মহাখালি হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হবে। সামসু রিকশা নিয়ে গেটের বাইরে অপেক্ষা করছিল। বিলকিস এলে তাকে রিকশায় করে হাফিজের বাসার কাছে পৌঁছে দিল।

রিকশা থেকে নেমে বিলকিস বলল, চাচা, আপনি যে আমাকে এখানে পৌঁছে দিলেন, একথা বাসার কাউকে বলবেন না। তারপর তাকে চলে যেতে বলে হাফিজের রুমের দরজার কাছে যেতে শুনতে পেল সে ক্বুরআন শরীফ পড়ছে। দরজার কড়া দু'তিনবার নাড়া দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

হাফিজ কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে ক্বুরআন শরীফ বন্ধ করে দরজা খুলে বিলকিসকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। তারপর সামলে নিয়ে বলল, এ সময় তুমি এলে কি করে? এস, ভিতরে এস।

বিলকিস ভিতরে এসে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

হাফিজ ক্বুরআন শরীফ তাকে তুলে রেখে বলল, এত ভেঙে পড়ছ কেন? সামলাবার চেষ্টা কর।

বিলকিস কিছুটা সামলে নিয়ে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, এটা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না। তুমি কাল অপমানিত হয়ে এসেছ শোনার পর থেকে আমি খুব বেসামাল হয়ে পড়ি। শেষে এই পথ বেছে নিলাম।

হাফিজ বলল, আমি নিজের জন্য কখনও কোনো কিছু চিন্তা করিনি। গতকাল তোমার ভাইয়ার ব্যবহারে দুঃখ পেলেও তা সহ্য করার ক্ষমতা আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। আমি তোমার চিন্তায় সারারাত ঘুমাতে পারিনি। শেষে ক্বুরআন শরীফ পড়ছিলাম।

বিলকিস বলল, আমি এভাবে চলে এসেছি বলে তুমি কি অসন্তুষ্ট হয়েছ?

হাফিজ বলল, একথা তুমি বলতে পারলে? আমার কথায় কি তুমি অসন্তুষ্ট হবার মতো কিছু পেয়েছে?

বিলকিস বলল, কথাটা বলে আমি ভুল করেছি। মাফ করে দাও। আমার মনে হচ্ছে, এভাবে এসে তোমাকে কোনো বিপদে ফেললাম না তো?

হাফিজ বলল, তোমার এখন মনের যা অবস্থা এই রকম মনে হওয়া স্বাভাবিক। এখন ওসব কথা থাক। আযান হয়ে গেছে। আমি মসজিদ থেকে নামায পড়ে আসি। বদনায় পানি আছে, অজু করে তুমিও নামায পড়ে নাও। তারপর সে মসজিদে চলে গেল।

গত রাতে বিলকিসদের বাসা থেকে ফিরে এসে হাফিজ চাচাতো ভাই মোসলেমকে ও ভাবি মাসুদাকে ঘটনাটা বলেছিল। শুনে তারা বলেছিল, বিলকিস যদি সত্যি সত্যি তোকে ভালোবেসে থাকে, তা হলে তার গার্জেনরা তাকে আটকে রাখতে পারবে না। মোসলেমও মসজিদে নামায পড়তে গিয়েছিল। নামাযের পর ফেরার পথে হাফিজ তাকে বিলকিসের চলে আসার কথা বলল।

মোসলেম বলল, দেখলি তো, আমরা কাল তোর কথা শুনে যা বলেছিলাম তাই হল। এখন চল, তোর ভাবির সঙ্গে পরামর্শ করে বিয়ের কাজটা প্রথমে সেরে ফেলতে হবে।

মাসুদা নামায পড়ে থালা-বাসন মাজবে বলে কলতলায় যাচ্ছিল, স্বামীর সঙ্গে হাফিজকে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মোসলেম বলল, এখন থালা-বাসন মাজা রেখে হাফিজের রুমে চল, কথা আছে। তারপর বিলকিসের চলে আসার কথা বলে বলল, কি করা যায় বল তো?

মাসুদা বলল, আগে হাফিজের ঘরে চল, তারপর বলছি। ঘরে এসে দেখল, বিলকিস বসে বসে চোখের পানি ফেলছে। মাসুদা বলল, কাঁদছ কেন ভাই? প্রেমের পথ যে কণ্টকে পূর্ণ তা কি জান না? সেই পথে চলতে হলে কাঁটা তো ফুটবেই। কাঁটার যন্ত্রণা তো সহ্য করেতেই হবে।

মোসলেম স্ত্রীকে বলল, ওসব বলার অনেক সময় পাবে। এখন যা বলছি শোন, সকালের দিকেই কাজী ডেকে ওদের বিয়েটা পড়িয়ে দিতে হবে। পরে উকিলকে দিয়ে কোর্টের কাজ সেরে নিলে হবে। তারপর ওদেরকে অন্য কোনো বাসায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। বিলকিসকে না পেয়ে ওর গার্জেনরা এখানে খোঁজ নিতে আসতে পারে।

মাসুদা বলল, আসে আসবে, তাতে আমাদের কি? বিয়ে পড়ান হয়ে গেলে তারা কিছু করতে পারবে না। বিলকিস সাবালিকা ও শিক্ষিতা মেয়ে।

মোসলেম বলল, তোমার কথা ঠিক। তবে থানায় মেয়ে হাইজ্যাক করার কেস করে পুলিশ নিয়ে আসতে পারে। তার চেয়ে অন্য বাসায় রাখলে ঝামেলা হবে না।

হাফিজ বলল, ভাইয়া ঠিক কথা বলেছে। আমার এক বন্ধু ঠিক এভাবে না হলেও মেয়ের গার্জেনদের অমত থাকায় কোর্ট ম্যারেজ করে মেয়েকে নিয়ে যাদের বাসায় থাকত, তাদের বাসায় ছিল। মেয়ের বাবা কেস করে পুলিশের সাহায্যে তাদেরকে এ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য কেস টিকেনি। মেয়ে স্বামীর হয়ে বাবার বিরুদ্ধে কথা বলায় কেস ডিসমিস হয়ে যায়। তাই বলছি, বিয়ের কাজ মিটে গেলে আমি সেই বন্ধুর বাসায় ওকে নিয়ে চলে যাব। আমাদের ব্যাপারটা তারা জানে।

মোসলেম বলল, সেটাই ঠিক হবে। তারপর স্ত্রীকে বলল, তুমি এদিকটা একটু গোছগাছ করে নাও। আমি কাজীকে ডেকে আনার ব্যবস্থা করছি। কথা শেষ করে স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সেদিন বেলা ন'টার মধ্যে সব কিছু মিটে যাওয়ার পর হাফিজ বিলকিসকে নিয়ে তেজগাঁয়ে বন্ধু জাকিরের বাসায় গিয়ে উঠল।

জাকির তখন অফিসে চলে গেছে। তার স্ত্রী রিমা হাফিজের কাছে ঘটনা শুনে বলল কোনো অসুবিধে নেই। আমাদের একটা রুম খালি পড়ে আছে। যতদিন ইচ্ছা থাকতে পারবেন।

বিকেলে জাকির অফিস থেকে ফিরে হাফিজের মুখে সব কথা শুনে বলল, রিমা আর ভাবি তা হলে একই গোয়ালের গরু?

রিমা কপট রাগ দেখিয়ে বলল, আমরা গরু, আর তোমরা বুঝি সাধু? আমরা যদি একই গোয়ালের গরু হই, তা হলে তোমরা সেই গোয়ালের রাখাল।

জাকির একটু রেগে গিয়ে বলল, একটু মুখ সামলে কথা বল, আমরা তোমাদের স্বামী।

রিমা বলল, তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? গরুদের লালন-পালন করে তো রাখালরা, স্বামীরা কি স্ত্রীদেরকে তাই করে না?

জাকির বলল, তোমার কথা অস্বীকার করছি না। তবু ইতর প্রাণীর সাথে স্বামীদেরকে তুলনা করা ঠিক হয়নি।

রিমাও ছাড়বার পাত্রী নয়। বলল, স্বামীরা করলে বুঝি দোষ হয় না?

হাফিজ হাসতে হাসতে বলল, কিসব বাজে কথা নিয়ে তোরা তর্ক করছিস? বাদ দে এই প্রসঙ্গ।

জাকির বলল, তোর ভাবির কাণ্ড দেখলি? আমি কোথায় একটু রসিকতা করলাম, আর ও কিনা রেগে গিয়ে তর্ক জুড়ে দিল।

হাফিজ বলল, হয়েছে হয়েছে। এখন ওসব বাদ দিয়ে বল, তোর কাছে আমরা কিছুদিন থেকে একটা বাসা ভাড়া নিয়ে চলে যাব। তাতে তোদের কোনো অসুবিধে হবে না তো?

জাকির বলল, একটুও না। যতদিন ইচ্ছে থাক। আর বাসা ভাড়ার কথা যে বললি তাতেও বাধা দেব না। তবে আমাদের তো তিনটে রুম, দু'টো আমরা ব্যবহার করি। আর যেটাতে তোদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে, সেটা সাবলেট দিই। যারা ছিল তারা এই মাসে চলে গেছে। তোরা ইচ্ছা করলে ভাড়া নিতে পারিস।

হাফিজ বলল, নেব না কেন? নিশ্চয় নেব। ভাড়া বাসা আর খুঁজতে হল না। তা ছাড়া আমরা অফিসে চলে যাওয়ার পর ওরা দু'জনে গল্প করে সারাদিন বেশ আনন্দে থাকবে।

হাফিজ এখানে থেকে অফিস করতে লাগল।

এদিকে পরের দিন সকালে ইশিতা মাকে বলল, ঘুম থেকে উঠে আপাকে দেখছি না।

শাফিয়া বেগম চমকে উঠে বললেন, সে কি রে, রাথরুমে দেখেছিস?

ইশিতা বলল, রাথরুমে, ছাদে, ঘরের পিছনে ফুলের-বাগানে, সবখানে দেখেছি, কোথাও নেই।

শাফিয়া বেগম বেশ চিন্তিত হয়ে বললেন, কোনো বান্ধবীর বাসায় যায়নি তো?

ইশিতা বলল, এত সকালে যাবে কেন? তা ছাড়া কোথাও গেলে আমাকে অন্তত বলে যেত।

শাফিয়া বেগম বললেন, আর একবার খুঁজে দেখ।

ইশিতা নিজের দোষ এড়াবার জন্য খবরটা মাকে জানাতে এসেছিল। মায়ের কথা শুনে ফিরে এসে নিজের রুমে বসে বসে চিন্তা করতে লাগল, ভাইয়া জানলে কি করবে কি জানি!

নাশতা খাওয়ার সময় শাফিয়া বেগম হাসানকে বললেন, বিলকিস কাউকে কিছু না বলে চলে গেছে। এখন কি হবে? তুই এত বাড়াবাড়ি না করলে এরকম হত না। যদি সে সুইসাইড করে বসে, তা হলে কি হবে ভেবে দেখ। তারপর তিনি চোখে আঁচল দিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

বিলকিস চলে গেছে শুনে হাসান প্রথমে খুব রেগে গিয়েছিল। পরে সুইসাইডের কথা শুনে ও মায়ের চোখে পানি দেখে ভাবল, আমি কি ভুল করলাম? তখন তার মন বিলকিসের প্রতি মমতায় ভরে উঠল। তাকে সে কত ভালোবাসে! ইশিতাকেও ভালোবাসে। ইশিতার চেয়ে বিলকিস অনেক ধীর ও নম্র। একগুঁয়েমি ছাড়া তার আর কোনো দোষ নেই। ইশিতা তাকে প্রায় দিন এটা-সেটা আনার হুকুম করে। আর বিলকিস কখনও কোনো কিছু আনার আব্দারও করে না। বড় হয়ে সে তার খাওয়া-পরার দিকে কত লক্ষ্য রাখে। এসব ভাবতে ভাবতে হাসান খাওয়ার কথা ভুলে গেল। তার চোখ দুটো তখন পানিতে ভরে উঠেছে।

ইশিতা ভাইয়াকে ঐ অবস্থায় দেখে বলল, ভাইয়া, তুমি খাচ্ছ না কেন? সব কিছু তো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

হাসান হাত ধুতে ধুতে বলল, আর খেতে ইচ্ছা করছে না। তারপর অফিসে চলে গেল।

হাফিজ যখন হাসানদের বাড়ি রং করার কন্ট্রাক্ট নেয় তখন সে তার বাসার ঠিকানা জেনে নিয়ে ডায়েরীতে লিখে রেখেছিল। অফিসে গিয়ে ডায়েরী খুলে ঠিকানাটা একটা কাগজে লিখে নিয়ে মহাখালীতে মোসলেমের বাসায় গেল।

মোসলেম তখন ডিউটিতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল। তার বড় ছেলেটা এসে বলল, আব্বা, একটা লোক তোমাকে ডাকছে।

মোসলেম বেরিয়ে হাসানকে দেখে সালাম দিয়ে বলল, কেন এসেছেন বলুন? আমি তো আপনাকে চিনতে পারছি না।

হাসান বলল, এখানে হাফিজ নামে কেউ থাকে?

মোসলেম সাবধান হয়ে গেল। বলল, অনেক দিন সে আমার কাছে পেয়িংগেষ্ট হিসেবে ছিল। চাকরি হওয়ার পর চলে গেছে।

এখন কোথায় থাকে বলতে পারেন?

না, তা পারব না।

ঠিক আছে, আসি বলে হাসান ফিরে যেতে উদ্যত হলে মোসলেম বলল, আপনার পরিচয়টা বলুন।

হাসান বলল, আপনি বোধ হয় জানতেন, হাফিজ একটা মেয়েকে প্রাইভেট পড়াত। আমি তার বড় ভাই। তারপর সে গাড়িতে উঠে চলে গেল।

মোসলেম ঘরে ফিরে এসে স্ত্রীকে সব কথা বলে ডিউটিতে চলে গেল।

ফেরার সময় হাসান চিন্তা করল, হাফিজের অফিসের ঠিকানা জানা থাকলে তাকে খুঁজে পেতাম। তারপর অনেক খোঁজাখুঁজি করেও হাফিজ বা বিলকিসের সন্ধান পেল না। নিজেদের সম্মানের কথা ভেবে হাসান থানাতে জি.ডি. করল না এবং কাগজেও নিখোঁজ সংবাদ দিল না। তার দৃঢ় ধারণা হল, বিলকিস সুইসাইড করতে পারে না। নিশ্চয় হাফিজকে বিয়ে করেছে।

প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পরে রকিব সাহেব জাপান থেকে ফিরে সব কিছু শুনে গম্ভীর হয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর হাসানকে যথেষ্ট তিরস্কার করে বললেন, এম.এ. পাস করে তুমি একটা জানোয়ার হয়েছ। তুমি আমার অনুপস্থিতিতে যে কাজ করেছ, তা ক্ষমার অযোগ্য। বিলকিস যদি কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়, তা হলে তোমাকে আমি বাসা থেকে বের করে দেব। যাও আমার সামনে থেকে। তোমার মতো ছেলের বাবা হয়ে নিজেকে ঘৃণাবোধ করছি।

হাসান অশ্রুভেজা চোখে বলল, বিলকিস যে এভাবে চলে যাবে আমি কল্পনাও করিনি। প্রথমে ভুল করলেও পরে তা বুঝতে পেরেছি বাবা। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

রকিব সাহেব আবার অনেক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, হাফিজের কাছে গিয়েছিলে?

সে যে বাসায় থাকত সেখানে গিয়েছিলাম। তারা বলল, চাকরি পাওয়ার পর হাফিজ বাসা ভাড়া নিয়ে চলে গেছে। কোথায় থাকে তারা বলতে পারল না।

তার অফিসে খোঁজ নাওনি?

কোন অফিসে কাজ করে জানি না। তবে ঢাকার প্রতিটি অফিসে খোঁজ নিয়েছি। কিন্তু পাইনি।

রকিব সাহেব টেলিফোন করে বিভিন্ন অফিসে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, জয়দেব পুরে একটা বিদেশী ফার্মে হাফিজ নামে একটা ছেলে কাজ করে। একদিন তিনি নিজে সেই অফিসে গেলেন।

হাফিজ রিসেপশন রুমে ছিল। রকিব সাহেবকে দেখে প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেল। তারপর দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে এগিয়ে এসে কদমবুসি করে বলল, কেমন আছেন?

রকিব সাহেব 'থাক বাবা থাক' বলে বললেন, ভালো আছি। বিলকিস কি তোমার কাছে আছে?

হাফিজ খুব লজ্জা ও ভয় পেল। মাথা নিচু করে বলল, জি আছে। তারপর গেষ্ট রুমে এনে বসতে বলে কলিংবেল বাজাল। একজন পিয়ন এলে তাকে কিছু ভালো বিস্কুট ও কেক এবং কোকের অর্ডার দিল।

রকিব সাহেব বললেন, তোমরা কি কোর্ট ম্যারেজ করেছ?

প্রথমে কাজি বিয়ে পড়ান। পরে উকিলকে দিয়ে কোর্টের কাজ করিয়েছি।

তোমরা থাক কোথায়?

কাওরান বাজার।

একটা টেলিফোন করে অন্তত জানাতে পারতে।

আমি জানাতে চেয়েছিলাম, আপনার মেয়ে জানাতে দেয়নি।

তোমার ছুটি তো আড়াইটায়?

জি। তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, সময় প্রায় হয়ে এসেছে। এমন সময় পিয়ন সব কিছু নিয়ে এলে হাফিজ তার হাত থেকে নিয়ে নিজে পরিবেশন করে বলল, এগুলো খেয়ে নিন।

রকিব সাহেব সামান্য কিছু খেয়ে বললেন, চল, বিলকিসের সঙ্গে দেখা করে বাসায় ফিরব।

বিলকিস রান্নার কাজ সেরে গোসল করে খাটে শুয়ে একটা গল্পের বই পড়ছিল, আর মাঝে মাঝে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখছিল। দরজায় নক হতে বইটা রেখে দরজা খুলে হাফিজের সঙ্গে বাবাকে দেখে কয়েক সেকেণ্ড বিস্ময়ে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর 'বাবা' বলে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

রকিব সাহেবের চোখেও পানি এসে গেল, তিনি কিছু বলতে পারলেন না।

তাই দেখে হাফিজ স্ত্রীকে বলল, বাবাকে ভিতরে নিয়ে যাবে তো। বিলকিস কদমবুসি করে ভিতরে নিয়ে এস বসিয়ে বলল, তুমি ভালো আছ বাবা? মা, ভাইয়া ও ইশিতা ভালো আছে?

রকিব সাহেব ভিজে গলায় বললেন, হ্যাঁ মা, সবাই ভালো আছে। তারপর আবার বললেন, আমি না থাকায় হাসান যা করেছে, তা ভুলে যা। সে এখন অনুতপ্ত। তোরা দু'জন আজ আমার সঙ্গে চল। তোর মা খুব কান্নাকাটি করছে।

বিলকিস বলল, যাব বাবা। তুমি খেয়ে দেয়ে এখন বিশ্রাম নাও। তারপর যাব।

রকিব সাহেব সন্ধ্যার কিছু আগে মেয়ে-জামাইকে নিয়ে বাসায় ফিরলেন।

বিলকিস মা, ভাইয়া ও ইশিতাকে জড়িয়ে কান্নাকাটি করল।

হাসান বলল, তুই আমাকে মাফ করে দে। আমি তখন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।

হাফিজ প্রথমে শ্বশুর-শাশুড়ীকে কদমবুসি করে হাসানকে করতে গেলে সে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমাকে সালাম করে আর ছোট করো না। আমি সেদিন রাগের বশবর্তী হয়ে তোমাকে যা-তা বলে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছি। বড় ভাই হিসাবে আমাকে ক্ষমা করতে পার না?

হাফিজ বলল, আপনি এ কি বলছেন! বড়দের দোষ ধরা বেয়াদবি। সেদিন আমি কিছু মনে করিনি। আপনার বোনের কথা ভেবে মনে কষ্ট হয়েছিল। এখন সে সব আর কিছু নেই।

সেদিন কেউ তাদেরকে ফিরে আসতে দিল না। রাতে খাওয়ার পর ইশিতা আপার রুমের দরজার কাছে এসে বলল, আসতে পারি।

বিলকিস ও হাফিজ তখন খাটে বসে কথা বলছিল। বিলকিস বলল, আয়।

ইশিতা ভিতরে এসে বলল, আপা আমার স্যার তো তোমার স্বামী; এখন তাকে কি বলে ডাকব?

বিলকিস বলল, কেন, দুলাভাই বলে ডাকবি!

ইশিতা হাসতে হাসতে হাফিজকে বলল, স্যার থেকে দুলাভাইয়ে প্রমোশন পেয়ে কেমন লাগছে?

হাফিজও হাসতে হাসতে বলল, তুমি ছাত্রী থেকে শালীতে প্রমোশন পেয়ে তোমার যেমন লাগছে। এই কথায় তিনজন এক সঙ্গে হেসে উঠল।

ইশিতা বলল, আপাকে আমি না সাহায্য করলে আপনারা সাকসেসফুল হতে পারতেন না।

হাফিজ বলল, তাই নাকি?

ইশিতা বলল, আপাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

হাফিজকে তার দিকে চাইতে দেখে বিলকিস বলল, ও ঠিক কথাই বলেছে। তোমার কথা বাবা ও ভাইয়াকে বলার পর আমার উপর যত বিপদ এসেছে তত ও মুষড়ে পড়েছে। তোমার কাছে চলে যাওয়ার প্ল্যান-প্রোগ্রাম সব ওর।

হাফিজ বলল, তা হলে তো ওকে আমাদের খুব বড় পুরস্কার দেয়া উচিত।

ইশিতা বলল, আমি আপা ও আপনাকে সুখী দেখতে চেয়েছিলাম। তাই হয়েছেন জেনে আমিও সুখী। সেটাই আমার বড় পুরস্কার। আমি আর কোনো পুরস্কার চাই না।

হাফিজ বলল, তুমি খুব বুদ্ধিমতীর মতো কথা বলেছ। তোমার মনের মতো ছেলের হাতে তোমাকে তুলে দেয়া ছাড়া অন্য কোনো জিনিস পুরস্কার দিলে তোমাকে ছোট করা হবে।

ইশিতা বলল, আমার মনের খবর আপনারা পাবেন কেমন করে যে, সেই রকম ছেলের খোঁজ করবেন?

হাফিজ বলল, কারো কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারে তার মনের খবর পাওয়া যায়।

বিলকিস স্বামীকে বলল, জান, একেক সময় ওর কথা শুনে মনে হয়, ও যেন অনেক দিন প্রেমিক স্বামীর সঙ্গে ঘর করেছে। সব দিকে পাকা বুড়ি।

ইশিতা নিজের প্রশংসা শুনে লজ্জা পেয়ে বলল, আমি এখন যাই। আপনারা তো এতদিন মনের মধ্যে আতংক নিয়ে রাত্রি যাপন করেছেন। আজ নিশ্চিন্ত মনে মধুরাত্রী যাপন করুন। তারপর ছুটে পালিয়ে গেল।

বিলকিস লজ্জা মিশ্রিত হাসিমুখে বলল, ও যে কত পাকা তা স্বচক্ষে দেখলে তো?

পরের দিন হাফিজ অফিসে যাওয়ার সময় যখন বিলকিসকে বলল, ফিরে এসে তোমাকে নিয়ে যাব তখন শাফিয়া বেগম সেখানে ছিলেন। বললেন, তোমরা দু'জনে এখানে কয়েক দিন থাক। তুমি এখান থেকে অফিসে যাতায়াত করবে।

ওঁর মনে কষ্ট হবে ভেবে হাফিজ বলল, ঠিক আছে, তাই হবে আম্মা।

হাফিজ বেতন থেকে মাকে তাদের প্রয়োজন মতো টাকা পাঠিয়ে বাকি যা থাকে তা থেকে বাসা ভাড়া দিয়ে হিসাব করে সংসার চালিয়ে কিছু কিছু ব্যাংকে জমা করে। কোনো বাজে খরচ না করলেও বিলকিসের প্রসাধন সামগ্রী নিয়মিত কিনে দেয়।

প্রথম দিকে বিলকিস এসব ব্যাপার খেয়াল করে নি। কয়েক মাস পর খেয়াল হতে একদিন হাফিজকে জিজ্ঞেস করল, কত বেতন পাও বল তো?

হাফিজ একটু অবাক হয়ে বলল, এতদিন পর হঠাৎ বেতনের কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?

স্বামী কত বেতন পায়, স্ত্রীর কি জানার অধিকার নেই?

আছে। বেসিক পে আড়াই হাজার। হাউস রেন্ট, কনভেন্স ও মেডিকেল মিলিয়ে প্রায় পাঁচ হাজারের মতো।

সব টাকা কি সংসারে খরচ হয়ে যায়?

ঐ তো টাকা। প্রতি মাসে আম্মাকে এক হাজার করে পাঠাই, বাসা ভাড়া এক হাজার দিই। আমার ডেলী নিজস্ব কিছু খরচ আছে। তারপর যা থাকে সংসারে খরচ করি। ইচ্ছা করে ব্যাংকে জমা দেয়ার কথা বলল না।

দেশে তো আম্মা আর এক বোন, তাদের অত টাকা লাগবে কেন? তারচেয়ে এক কাজ কর, তোমার অফিসের কাছাকাছি দু'কামরা দেখে একটা বাসা ভাড়া নাও। তারপর আম্মা আর বোনকে নিয়ে চলে এস। একসঙ্গে থাকলে খরচ অনেকটা কমে যাবে। এখন ছোট সংসার। বুঝে-সুঝে না চললে ভবিষ্যতে ছেলেমেয়ে হলে তাদের মানুষ করবে কি করে?

বিলকিসের প্রথম দিকের কথা শুনে হাফিজ মনে কষ্ট পেলেও তার শেষের দিকের কথা শুনে তা দূর হয়ে গেল। বলল, তুমি যে দেখছি এই কয়েক মাসে পাকা গিন্নী হয়ে গেছ?

বিলকিস স্বামীর গলা জড়িয়ে বুকে মুখ গুঁজে বলল, এবার তো গিন্নী হতেই হবে। আমি যে মা... কথাটা লজ্জায় শেষ করতে না পেরে চুপ করে গেল।

হাফিজ বলল, কি হল? মা বলে চুপ করে গেলে কেন?

বিলকিস লজ্জায় রাঙা হয়ে বলল, আমি মা হতে চলেছি।

হাফিজ আনন্দে কয়েক সেকেণ্ড কথা বলতে পারল না। তারপর তাকে দু'হাতে তুলে কয়েকপাক ঘুরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সারা মুখে আদর দিতে দিতে বলল, এখন ক'মাস? এতদিন বলনি কেন?

বিলকিস স্বামীর আদর-সোহাগে হাঁপিয়ে উঠে বলল, মাত্র তিন মাস পার হয়েছে। এ অবস্থায় এ রকম করা তোমার ঠিক হয়নি। এমনি আমি খুব নার্ভাস ফিল করছি।

হাফিজ তাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, তুমি ঠিক কথা বলেছ। এবার আমাদেরকে বেশ সাবধানে চলতে হবে। খরচ কমাবার ব্যবস্থাও করতে হবে। আর তোমাকে কতকগুলো নিয়ম মেনে চলতে হবে।

বিলকিস উঠে বসে বলল, যেমন?

হাফিজ বলল, আমি লক্ষ্য করেছি তুমি নামাযের প্রতি বেশ অমনোযোগী, এবার ঠিকমতো নামায পড়বে। প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর কুরআন হাদিসের ব্যাখ্যা পড়বে। সাহাবাদের, নবীদের ও বড় বড় মনীষীদের জীবনি পড়বে। কারণ মায়ের সেকম ক্যামেরার মতো কাজ করে। ক্যামেরাতে যেমন ছবি উঠে, তেমনি সন্তান যত দিন মায়ের সেকমে থাকে ততদিন মা যা কিছু করবে সন্তান তার তাসির পাবে। অর্থাৎ বড় হওয়ার সাথে সাথে সন্তানের চরিত্রে সেই সব দেখা যাবে। ভালো সন্তান পেতে হলে সব মায়ের এই রকম করা উচিত।

এক ছুটির দিনে হাসান ইশিতাকে নিয়ে বোনের বাসায় এল। ঘরের আসবাবপত্র দেখে তার মন খারাপ হয়ে গেল। ভাবল, এভাবে থেকে বিলকিস কি সুখী? তাকে

ভালো করে লক্ষ্য করল। তার চেহারার মধ্যে অসুখীর কোনো লক্ষণ দেখতে পেল না। তবু খুশি হতে পারল না।

ইশিতা কিন্তু ওসব নিয়ে মাথা ঘামাল না। আপাকে হাসিখুশি দেখে তার মন আনন্দে ভরে গেছে।

প্রাথমিক আপ্যায়নের পর হাফিজ স্ত্রীকে বলল, তুমি লুচি বানাও, আমি দোকান থেকে কিছু মিষ্টি ও ফলটল নিয়ে আসি। আর ব্যাগটা দাও, সেই সঙ্গে বাজারটাও সেরে আসব। বিলকিস ব্যাগ এনে দিলে সে বেরিয়ে গেল।

হাসান বিলকিসকে বলল, লুচি পরে বানাস, আগে এগুলো তুলে রাখ। বাবা-মা পাঠিয়েছে। তারপর ব্রিফকেস খুলে সব কিছু টেবিলের উপর রাখল।

ইশিতা একটা একটা করে দেখাতে লাগল– এই দুলাভাইয়ের দু'টো প্যান্ট পিস ও শার্ট পিস। তোমার দুটো শাড়ি, পেটিকোর্ট ও ব্লাউজ। তারপর একটা ছোট বাক্স খুলে একটা বোতাম ও দু'টো আংটি বের করে বলল, তোমার ও দুলাভাইয়ের। আর বাকিগুলো সব তোমার। এই কানের দুল, গলার হার, হাতের কংকন ও নাকছবি। দেখ না আপা, জিনিসগুলো কি সুন্দর! আমি বাবার সঙ্গে গিয়ে ডিজাইন পছন্দ করে দিয়েছি।

বিলকিস সব কিছু দেখে খুব খুশি হল। সেই সঙ্গে একটু ভয়ও পেল। হাফিজ এইসব দেখে যদি অসন্তুষ্ট হয়।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে ইশিতা বলল, আপা তুমি খুশি হওনি?

বিলকিস বলল, খুশি হব না কেন? তুই ওগুলো খাটের উপর রাখ, তোর দুলাভাই এলে দেখাবি।

নাশতা খাওয়ার পর হাসান চলে আসতে চেয়েছিল। বিলকিস ও হাফিজ তাদেরকে দুপুরে না খাইয়ে ছাড়ল না।

দুপুরে খাওয়ার পর ইশিতা সব কাপড়-চোপড় ও গহনা হাফিজকে দেখিয়ে বলল, এগুলো আমি চয়েস করেছি, আপনার পছন্দ হয়েছে কিনা বলুন। হাসান তখন ছিল না। সে সিগারেট কেনার জন্য দোকানে গেছে।

হাফিজ বলল, তুমি হলে সব দিকে পাকা। তোমার চয়েস কি অপছন্দ হতে পারে!

ইশিতা গয়নাগুলো আপার আপত্তি ঠেলে তাকে পরিয়ে দিয়ে একটা শাড়ি ও ব্লাউজ পরার জন্য খুব জিদ ধরল।

বিলকিস বলল, পরে পরবখন। ভাইয়ার কাছে আমার লজ্জা করবে।

ইশিতা বলল, বা-রে, লজ্জা করবে কেন? জান না বুঝি, বড়রা কিছু দিলে তা পরে তাদেরকে সালাম করতে হয়!

হাফিজ বলল, ইশিতা ঠিক কথা বলেছে। তুমি শাড়িটা পর আমি বারান্দায় যাচ্ছি বলে সে বেরিয়ে গেল।

ইশিতা আপাকে শাড়ি ও ব্লাউজ পরিয়ে দিয়ে বলল, ইশ, বড় আয়না নেই, থাকলে দেখতে পেতে তোমাকে কত সুন্দর দেখাচ্ছে। তারপর বারান্দায় এসে হাফিজকে ভিতরে আসতে বলে বলল, দেখুন তো দুলাভাই, আপাকে চিনতে পারেন কিনা?

হাফিজ ভিতরে এসে বিলকিসের দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেণ্ড চোখের পলক ফেলতে পারল না। বলল, সত্যি তোমাকে অপূর্ব লাগছে। বিলকিস স্বামীকে কদমবুসি করে ইশিতাকে জড়িয়ে ধরে আদর করল। এমন সময় হাসান ফিরে এলে বিলকিস তাকে কদমবুসি করল।

হাসান বোনের মাথায় হাত ঠেকিয়ে চুমো খেয়ে বলল, তোকে তো কাপড়টা দারুন মানিয়েছে।

ইশিতা বলল, কে চয়েস করেছে দেখতে হবে তো!

হাসান বলল, ঠিক আছে, এবার চল ফেরা যাক। আসার সময় হাসান ও ইশিতা তাদেরকে যাওয়ার জন্য কয়েকবার তাগিদ দিয়ে গেল।

তারা চলে যাওয়ার পর বিলকিস একটা আংটি হাফিজের আঙুলে পরাতে গেলে হাফিজ হাতটা টেনে নিয়ে বলল, পুরুষদের সোনার জিনিস পরা হারাম।

বিলকিস বলল, তা হলে বোতামটাও পরবে না?

না।

ওগুলো কি হবে তা হলে?

কি আর হবে। আংটিটা তুমি ব্যবহার করতে পার। আর বোতামটা ভাঙিয়ে তোমার কোনো জিনিস গড়িয়ে দেব।

সত্যি কি পুরুষদের সোনার জিনিস পরা হারাম?

হ্যাঁ সত্যি। জেনে রেখ, মিথ্যা বলা নারী-পুরুষ সকলের জন্যে হারাম।

বাবা-মা এসব দিয়েছে বলে তুমি কি অসন্তুষ্ট হয়েছ?

তোমার তাই মনে হচ্ছে বুঝি বলে হাফিজ তাকে দু'হাতে তুলে নিয়ে তার মুখে কয়েকটা আদরের চিহ্ন এঁকে দিয়ে বলল, আল্লাহপাক তোমাকে এমনি সুন্দরী করে পয়দা করেছেন, তার উপর এসব পরাতে তুমি আরও অপূর্ব সুন্দরীতে পরিণত হয়েছ। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, শুধু দুঃখ কি জান, তোমার বাবা-মার আগে আমি তোমাকে এভাবে সাজাতে পারলাম না।

বিলকিস স্বামীকে জড়িয়ে ধরে আদরের প্রতিদান দিয়ে বলল, যা চেয়েছি তা পেয়েছি, আমি ধন্য। ওরমক কথা আর কখনও চিন্তা করবে না।

হাফিজের পাংচুয়েলিটি, কাজকর্ম ও ব্যবহারে সাহেব অত্যন্ত খুশি হয়ে তাকে অফিসার পদে প্রমোশন দিলেন। এখন হাফিজের মাসিক বেতন আগের চেয়ে প্রায় ডাবল। আর সে কোম্পানির কোয়ার্টারও পেল। এই খবরটা হাফিজ বিলকিসকে জানাল না। মাসের শেষে বেতন পেয়ে সোজা নিউ মার্কেটে গিয়ে ব্লাউজ পিসসহ দু'টো দামী শাড়ি ও একজোড়া কানের দুল ও কিছু মিষ্টি কিনে বাসায় ফিরল।

বিলকিস শাড়ির দু'টো বাক্স ও মিষ্টির প্যাকেট দেখে বলল, কি ব্যাপার এতসব কার জন্যে?

হাফিজ বলল, যার জন্যে সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

কি দরকার ছিল দু'টো শাড়ি কেনার। সারা মাস কিভাবে চলবে চিন্তা করেছ?

তা কি আর করিনি। তারপর পকেট থেকে কানের দুলের বাক্সটা বের করে খুলে তার হাতে দিয়ে বলল, দেখ তো, তোমার পছন্দ হয় কিনা।

বিলকিস দেখে বলল, দারুণ পছন্দ হয়েছে। কিন্তু তুমি এত টাকা পেলে কোথায়? বেতনের টাকায় যদি কিনে থাক, তা হলে তো পকেট গড়ের মাঠ করে এসেছ।

না, সখী না। আমি অত কাঁচা ছেলে না। মনের কামনা পূরণ করার জন্য আজ হাইজ্যাক করে টাকা রোজগার করেছি।

বিলকিস অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল।

কি, বিশ্বাস হচ্ছে না? তা হলে কাছে এস, কানে কানে বলব।

তোমার আজ কী হয়েছে বল তো? আসাআব্দি নাটকের প্রলাপের মতো বকে চলেছ?

এই মাসে নাটকীয়ভাবে আমার প্রমোশন হয়েছে। আজ প্রায় ডবল বেতন পেয়েছি। তাই মনের বাসনা চেপে রাখতে পারলাম না।

বিলকিস স্বামীকে জড়িয়ে ধরে হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলল, এতদিন এতবড় সংবাদটা জানাওনি কেন?

তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দেব বলে। আরও বাকি আছে। সেই সঙ্গে কোয়ার্টারও পেয়েছি। সামনের মাসের এক তারিখে আমরা কোয়ার্টারে চলে যাচ্ছি।

বিলকিস আনন্দের চোটে স্বামীকে কয়েকটা কিস দিয়ে বলল, এমন শুভ সংবাদে তোমাকে কি দিই বল তো?

এখন যা দিলে তা কম কিসে? বাকিটা না হয় রাতে দিও।

যাও! অসভ্য কোথাকার, মুখে যদি লাগাম থাকে।

আর তোমার মুখে বুঝি আছে? তুমি যে দিনে দুপুরে আমাকে কিস দিলে, সেটাতে তোমার দোষ হল না। আর আমি কিছু না করে শুধু ঐ কথা বলাতে দোষী হয়ে গেলাম?

হয়েছে বাবা হয়েছে, আর কখনও তোমাকে কিস দেব না।

তুমি না দিলেও আমি দেব বলে হাফিজ তার গালে কয়েকটা কিস দিল।

নাশতা খাওয়ার সময় বিলকিস কাপড়ের দুটো বাক্স খুলে বলল, ওমা! এ যে দেখছি দুটোই দামী শাড়ি। একটা অর্ডিনারি কিনতে পারতে?

পারতাম না। কারণ একটা ইশিতার জন্য কিনেছি। ওকে তো আমরা কিছুই দিই নি।

খুব ভালো করেছ। কিন্তু ভাইয়ার জন্য কিছু কেনা উচিত ছিল।

তুমি ঠিক বলেছ যেদিন ওটা দিতে যাব, সেদিন ভাইয়ার জন্য প্যান্ট ও শার্টের পিস কিনে নিয়ে যাব, কি বল?

না, এখন না কেনাই ভালো। এ মাসে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে। তা ছাড়া শুধু ভাইয়াকে দিলে বেমানান দেখাবে। সেই সঙ্গে মা-বাবার জন্যও কিছু নিতে হবে সামনের মাসে বেতন পাওয়ার পর যা করার করা যাবে।

ঠিক কথা বলেছ। এই না হলে আদর্শ গৃহিণী।

হয়েছে, অত আর গুণ গাইতে হবে না, এবার কিন্তু মাঝে মাঝে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে। সেই সময় সিনেমাও দেখাতে হবে। এতদিন তোমার বেতনের কথা ভেবে কোনো আব্দার করিনি।

বেড়াতে নিশ্চয় নিয়ে যাব। কিন্তু সিনেমা দেখাতে পারব না।

কেন?

আমি কখনও সিনেমা দেখিনি।

তাতে কি হয়েছে। এখন আমার সঙ্গে দেখবে।

না।

কারণ?

সিনেমা দেখা ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নাজায়েজ।

বা-রে তা কেন হবে? সিনেমা শিক্ষার একটা বড় মাধ্যম।

তুমি কি শিক্ষা গ্রহণ করার উদ্দেশ্য দেখবে, না চিত্তবিনোদনের জন্যে? যদি শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে হয়, তা হলে বলব, ভালো ভালো লেখকের বই পড়, নানান রকম ধর্মীয় বই এবং পৃথিবীর ধর্ম প্রবর্তকদের ও মনীষীদের জীবনি পড়। আর যদি চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে হয়, তা হলে দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বিখ্যাত বিখ্যাত দর্শণীয় স্থান দেখ। তাতে মনে যেমন আনন্দ পাবে তেমনি স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে। সেই সঙ্গে পৃথিবীর মানব সমাজকে জানতে পারবে এবং অনেক জ্ঞানও আহরণ করতে পারবে। আর আল্লাহপাকের অপূর্ব সৃষ্টি দেখে মনে অনেক শান্তি পাবে।

তা হলে তুমি কি বলতে চাও, বিজ্ঞানের এই সমস্ত আবিষ্কার মানুষের কোনো উপকার করছে না?

তা বলব কেন? আবিস্কারকরা মানুষের উপকারের জন্য সবকিছু আবিস্কার করছেন। কিন্তু মানুষরা সেগুলোকে ব্যবসা ভিত্তিক করে সামাজের অনেক ক্ষতি সাধন করছে। তুমি বল, বর্তমানে সিনেমাতে নায়ক-নায়িকারা যে পোশাক পরে, তা কি অশালীন নয়? তার উপর নায়িকারা অঙ্গভঙ্গি করে যেভাবে যৌবন প্রদর্শন করে তা কি শোভনীয়? একটা কথা তুমি চিন্তা করে দেখ, সিনেমাতে মেয়েরা যেভাবে অশালীন অবস্থায় নাচ গান করে, তা কি সব রকমের আত্মীয় স্বজন ও ছেলেমেয়ের সঙ্গে দেখা উচিত? যেখানে আল্লাহপাক ক্বুরআনে বলিয়াছেন, "তোমরা কোনো অশালীন দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে দেখ না।" পুরুষদেরকে ও নারীদেরকে রাস্তার দিকে চেয়ে মাথা নিচু করে চলতে বলেছেন। সেক্ষেত্রে সিনেমা দেখতে গেলে আল্লাহপাকের হুকুম অমান্য করা হবে না কি? তবে তুমি যদি বল, যারা মীন মাইণ্ডেড তারা ঐসবের খারাপ দিকটা দেখে। তার উত্তরে একটা হাদিস বলছি শোন, আমাদের নবী (দঃ) বলিয়াছেন, "যদি কোনো পুরুষ কোনো যুবতী মেয়েকে পর্দাহীন অবস্থায় দেখে বলে, আমার মন অত নীচ নয় যে, ঐ যুবতীকে দেখে আমার মনে খারাপ কিছু উদিত হবে, তা হলে সে নপুংসক অথবা মিথ্যাবাদী।" এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, সিনেমা দেখা কেন ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নাজায়েজ।

বিলকিস বলল, তবু কিন্তু অনেক কথা রয়ে যাচ্ছে।

হাফিজ বলল, তা আমিও জানি। বলছি, শোন, এক শ্রেণীর মানুষ আছে, তারা আল্লাহ ও নবী (দঃ)-কে অস্বীকার করে না। কিন্তু তাঁদের সব আদেশ পছন্দ করে না। নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তারা যুক্তি তর্কের মাধ্যমে ঐ সমস্ত নাজায়েজ আইনগুলোকে জায়েজ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা যতই যুক্তিতর্কের মাধ্যমে জায়েজ করার চেষ্টা করুক না কেন, আল্লাহপাকের এক শ্রেণীর ইমান্দার বান্দা তার প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবেই। তারা কোনোদিন মানুষের সেই সব আইন মেনে নেবে না। মানুষ আল্লাহপাকের ও রসুল (দঃ)-এর আইন না মানতে পারে, তাই বলে তাঁদের আইনের রদবদল কেউ কেয়ামত পর্যন্ত করতে পারবে না। আল্লাহ মানুষকে বিবেক দিয়ে ভলো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা দিয়ে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন, তাঁর নির্দেশমতো ভালো পথে চললে ইহকালে যেমন সুখ-শান্তিতে থাকবে, তেমনি পরকালেও অনন্তকাল ইহকালের চেয়ে লক্ষকোটিগুণ বেশি সুখ-শান্তিতে থাকবে। তুমি ধর্মীয় বই বোধ হয় কম পড়েছ। আলমারীতে অনেক ঐ ধরণের বই আছে, পড়ো। দেখবে সিনেমা-টিভি দেখে তুমি যা আনন্দ পাও, তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি আনন্দ তো পাবেই, আরও পাবে অনাবিল শান্তি। এরপরও যদি কিছু বলতে চাও পরে বলো, আলোচনা করে বুঝিয়ে দেব। বিলকিস কিছু না বলে চিন্তা করল, হাফিজ গোঁড়া ধার্মিক। এসব ব্যাপারে তার সঙ্গে কথা বলা বৃথা।

কোয়ার্টারে আসার এক সপ্তাহ পরে এক ছুটির দিন হাফিজ বিলকিসকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি এল। হাফিজের প্রমোশন ও কোয়ার্টার পাওয়ার কথা শুনে সকলে খুব খুশি হল। ইশিতা সেই খবর শুনে ও কাপড় পেয়ে আনন্দে আটখানা। শাড়িটা পরে সবাইকে সালাম করে হাফিজকে করার সময় বলল, আপনার উপহার পেয়ে এবং প্রমোশনের কথা শুনে আমি আনন্দিত। আমার অন্তরের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

হাফিজ দো'য়া করল, আল্লাহপাক তোমার মনের নেক মকসুদ পূরণ করুক। তারপর বলল, আর একটা শুভ সংবাদ জানান হয়নি। কাছে সরে এস বলছি। ইশিতা কাছে এলে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, তোমার আপা মা হতে চলেছে।

কথাটা শুনে ইশিতা আনন্দে টগবগিয়ে উঠে আপাকে জড়িয়ে ধরে বলল, দুলাভাই যা বললেন তা সত্যি?

বিলকিস লজ্জা পেয়ে শুধু মাথা নেড়ে সায় দিল।

ইশিতা তাকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে রুম থেকে যাওয়ার সময় বলল, যাই, মাকে কথাটা বলি গিয়ে।

শুনে শাফিয়া বেগম খুশি হয়ে স্বামীকে জানালেন।

রকিব সাহেব আনন্দিত হয়ে বললেন, তুমি তা হলে নানি হতে যাচ্ছ?

শাফিয়া বেগম বললেন, আর তুমিও তো নানা হবে।

রকিব সাহেব হেসে উঠে বললেন, তা তো হবই।

শাফিয়া বেগম বললেন, এবার হাসানের বিয়ে দিয়ে দাদা হবার ব্যবস্থা কর।

রকিব সাহেব বললেন, তুমি ঠিক কথাই বলেছ। আমি সেই ব্যবস্থা করছি।

হাফিজ বিকেলে বিলকিসকে নিয়ে জয়দেবপুরে ফিরে এল। আসার সময় ইশিতাকে বাসার ঠিকানা দিয়ে বাবা-মাকে নিয়ে আসতে বলে এল।

পরের দিন হাফিজ অফিসে এসে সায়রার চিঠি পেল। সে লিখেছে, মায়ের খুব কঠিন অসুখ। চিঠি পাওয়া মাত্র রওয়ানা দেবে। চিঠি পড়ে হাফিজের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। প্রতি মাসে সায়রা চিঠিতে লেখে মায়ের শরীর দিন দিন ভেঙে পড়ছে। তুমি বাড়িতে এসে মাকে দেখে যাও। যাই যাই করেও তার যাওয়া হয়নি। আজ চিঠি পেয়ে মায়ের অসুখের কথা লিখে এক সপ্তাহের ছুটির জন্যে দরখাস্ত করল। সাহেব তা মঞ্জুর করলেন।

স্বামীকে মন খারাপ করে ফিরতে দেখে বিলকিস জিজ্ঞেস করল, তোমার কি শরীর খাপার?

হাফিজ বুক পকেট থেকে চিঠিটা বের করে তার হাতে দিয়ে বলল, পড়ে দেখ।

বিলকিস পড়ে বলল, তোমার যাওয়া একান্ত দরকার।

হ্যাঁ, অনেকদিন থেকে যাব যাব করেও যাওয়া হয়নি। তাই চিঠি পেয়ে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছি। ভাবছি আজ রাতে বা কাল সকালে রওয়ানা দেব। কিন্তু আমার খুব ইচ্ছা ছিল, তোমাকে সাথে করে নিয়ে যাওয়ার। আম্মাকে এখনও বিয়ের কথা জানান হয়নি।

এটা তুমি বোধ হয় ভুল করেছ। চিঠিতে জানাতে পারতে।

তা পারতাম। জেনে মা মনে কষ্ট পাবেন মনে করে জানাইনি। ভেবেছিলাম, একসঙ্গে গিয়ে আম্মার কাছে ক্ষমা চেয়ে তুষ্ট করব। কিন্তু তোমার এই অবস্থা। এত জার্নি কী তুমি সহ্য করতে পারবে?

ট্রেনে বা বাসে উঠলেই আমার মাথা ঘুরে। বারবার বমি হয়। তার উপর এই অবস্থায় গেলে বমি করে করে মরে যাব। এক কাজ কর, আজ রাতে আর কষ্ট করে যাওয়া দরকার নেই। কাল সকালে তুমি একা গিয়ে মাকে ও সায়রাকে নিয়ে চলে এস। ওদের আর দেশে থাকার দরকার নেই। মাকে এনে ভালো করে চিকিৎসা করাও। আর সায়রাকে স্কুলে ভর্তি করে দাও।

তুমি খুব সুন্দর কথা বলেছ। আমিও তাই ভেবেছি।

হাফিজ ঐদিন বিকেলে কয়েক দিনের হাট-বাজার করে দিয়ে বলল, একা থাকতে তোমার ভয় করবে না তো?

বিলকিস বলল, ভয়ের কি আছে। সব ফ্লাটে তো ফ্যামিলি রয়েছে। তা ছাড়া কাজের মেয়েটা তো আছেই। যে ক'দিন তুমি থাকবে না, সে ক'দিন ওকে আমাদের রুমে মেঝেয় বিছানা করে শুতে বলব। কোয়ার্টারে আসার পর হাফিজ একটা কাজের মেয়ে রেখেছে।

হাফিজ দেশে গিয়ে মাকে ডাক্তার দেখিয়ে একটু সুবিধেমতো হলে, তাকে ও সায়রাকে নিয়ে পাঁচদিন পর ফিরে এল।

সবুরা বানু বহুদিন থেকে অর্ধাহারে-অনাহারে থেকে এবং তার উপর নফল রোযা রেখে রেখে নানারকম রোগে ভুগছেন। মা ও মেয়ে হাফিজের চিঠিতে জেনেছিল, সে বড় চাকরি পেয়েছে। অনেক টাকা বেতন পায়। এখানে এসে তারা সবকিছু দেখে অবাক।

বাসায় পৌঁছাবার পর বিলকিস শাশুড়ীকে কদমবুসি করে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন আম্মা? পথে কোনো অসুবিধে হয়নি তো?

সবুরা বানু খুব অবাক হয়ে ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, কে রে মেয়েটা?

হাফিজ মায়ের পাশে বসে বলল, তোমার বৌ। হঠাৎ করে বিয়েটা হয়েছে তাই তোমার হুকুম নিতে পারিনি। তারপর মায়ের পায়ে হাত দিয়ে বলল, তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও, আম্মা।

সবুরা বানু বিলকিসের হাত ধরে কাছে টেনে তার মাথায় ও মুখে হাত বুলিয়ে চুমো খেয়ে বললেন, এত সুন্দর বৌ করেছিস দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। তারপর দো'য়া করে সায়রাকে বললেন, তোর ভাবিকে সালাম কর।

সায়রা সালাম করার জন্যে এগিয়ে এলে বিলকিস তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, থাক বোন, আমাকে সালাম করতে হবে না।

হাফিজ ডাক্তার এনে মায়ের চিকিৎসা করাতে লাগল। সায়রাকে নাইনে ভর্তি করে দিল।

বিলকিস সংসারের কাজকর্ম করার সাথে সাথে শাশুড়ির পরিচর্যা করতে লাগল। তার খাটনি অনেক বেড়ে গেছে। প্রথম পোয়াতি তাই বেশ কষ্ট হতে লাগল। কাজের মেয়েটা ও সায়রা তাকে বেশ সাহায্য করে। তবু বিলকিস দিন দিন যেন হাঁপিয়ে উঠতে লাগল।

হাফিজ একদিন শ্বশুর বাড়িতে ফোন করে মা-বোনের আসার কথা জানাল।

এদিকে হাসানের বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে। মেয়ে জামাইকে দাওয়াত করার জন্য রকিব সাহেব নিজে যাওয়ার মনস্থ করলেন। ভাবলেন, এক কাজে দু'কাজ হয়ে যাবে। দাওয়াত দেয়াও হবে আর বিয়ানের সঙ্গে পরিচয়ও করা যাবে। সে কথা স্ত্রীকে জানাতে শাফিয়া বেগম বললেন, তুমি একা বিয়ানের সঙ্গে পরিচয় করবে, আর আমার করার দরকার নেই বুঝি?

রকিব সাহেব বললেন, আমি কি তোমাকে যেতে নিষেধ করেছি?

যাওয়ার দিন ইশিতা শুনে বলল, আপাকে অনেকদিন দেখিনি, আমিও যাব।

একদিন রকিব সাবে স্ত্রী ও ইশিতাকে নিয়ে বিলকিসের বাসায় এলেন।

সুবরা বানু আগের চেয়ে একটু সুস্থ হয়েছেন। তবে চলাফেরা করতে পারেন না।

রকিব সাহেব ও শাফিয়া বেগম সে কথা শুনে তার রুমে গিয়ে পরিচয় করলেন।

সবুরা বানু পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। তাই আধহাত ঘোমটা টেনে বিয়াইয়ের সঙ্গে আলাপ করলেন।

রকিব সাহেব আলাপ করে বেরিয়ে আসার পর শাফিয়া বেগম আলাপ করতে লাগলেন।

ইশিতা সবুরা বানুকে সালাম করে বলল, কেমন আছেন মাওই মা? আমি আপনার বৌমার ছোট বোন।

সবুরা বানু তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে চুমো খেয়ে বললেন, বেঁচে থাক মা। আল্লাহ তোমাকে সুখী করুক।

শাফিয়া বেগম মেয়ের চেহারা অনেক রোগা হয়ে গেছে দেখে এবং তার খাটাখাটনি দেখে তাকে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবলেন। হাসানের বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র জামাইয়ের হাতে দিয়ে বললেন, বিলকিসকে আমি নিয়ে যাই। পনের দিন পরে তো হাসানের বিয়ে। এই ক'টা দিন আগেই না হয় গেল।

ইশিতা সেখানে ছিল। সে বলে উঠল, মাওই মার যা অবস্থা ওনাকে তা হলে কে দেখবে?

শাফিয়া বেগম মেয়েকে ধমক দিয়ে বললেন, তুই চুপ কর। বড়দের কথার উপর কথা বলছিস কেন? সব সময় পাকামি।

হাফিজ বলল, সায়রা ও কাজের মেয়ে আছে, অসুবিধে হবে না। ওকে আপনারা নিয়ে যান।

বিলকিসের যাওয়ার খুব ইচ্ছা। সে এতক্ষণ স্বামী কি বলে শোনার অপেক্ষায় ছিল। তার কথা শুনে বলল, আম্মার কথা ভেবে যেতে মন চাচ্ছে না। কিন্তু ক'দিন থেকে পেটে বেশ পেইন হচ্ছে। ডাক্তারকে বলতে বলল, আপনার এখন কমপ্লিট রেস্ট দরকার। হাফিজ বলল, কই, সে কথা তো তুমি আমাকে জানাওনি। ঠিক আছে; তুমি যাও। আম্মার জন্যে চিন্তা করতে হবে না।

সেদিন বিলকিস মা-বাবার সঙ্গে আসার সময় স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বলল, যাচ্ছি বলে তুমি কি রাগ করলে?

আম্মাকে এই অবস্থায় ফেলে বিলকিস সত্যি সত্যি যাবে হাফিজ চিন্তা করতে পারেনি। শাশুড়ির কথা শুনে এমনি তাকে যাওয়ার কথা বলেছিল। মনে ব্যথা পেলেও বলল, ভুলে যাচ্ছ কেন, সব থেকে তোমার এখন রেস্ট দরকার।

বিলকিসের মন তখন মা-বাবার সঙ্গে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল। অনেক দিন একঘেয়েমি জীবন কাটিয়ে উঠার জন্য তার মন অস্থির হয়ে উঠেছে। স্বামী যে মনে ব্যথা পেয়েছে, তা বুঝতে পারল না। কদমবুসি করে তাকে যাওয়ার কথা বলে মা-বাবার সঙ্গে গাড়িতে উঠল।

ইশিতাও দুলাভাইকে বারবার যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে গেল।

বিলকিস চলে যাওয়ার তিন-চার দিন পর থেকে সবুরা বানুর অসুখ বেড়ে গেল। যে ডাক্তার দেখছিলেন,তার চিকিৎসায় কাজ না হতে হাফিজ মাকে সাভারের এক ক্লিনিকে ভর্তি করল। মায়ের অসুখের কথা অফিস থেকে ফোন করে বিলকিসকে জানাল।

বিলকিস বলল, আমার শরীর তেমন ভালো নয়। এখানে আসার পর থেকে আমাশায় ভুগছি। তুমি সময় করে একদিন আসবে।

হাফিজ বলল, আমার সময় কোথায়? অফিসের টাইম ছাড়া মায়ের কাছে আমাকে সব সময় থাকতে হয়। সায়রা বাসা সামলাবে, না মায়ের কাছে থাকবে? তবু সময় করে একবার চেষ্টা করব। তুমি অফিসে ফোন করে তোমার শরীরের অবস্থা জানাবে। তারপর ফোন ছেড়ে দিল।

শাফিয়া বেগম মেয়েকে ফোনে কথা বলতে দেখেছন। বিলকিস কাছে এলে জিজ্ঞেস করলেন, কার সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলি?

বিলকিস বলল, তোমার জামাই ফোন করেছিল।

কি বলল? এতদিন হয়ে গেল একবারও এল না কেন?

আসবে কি করে, আমার শাশুড়ীর অসুখ বেড়েছে। তাকে ক্লিনিকে ভর্তি করেছে।

তাই নাকি? তা হলে তো তাকে আমাদের একবার দেখতে যাওয়া উচিত।

তোমরা যেতে চাইলে যাও, আমি যেতে পারব না। আমাশা হয়ে কতবার যে ল্যাটরিনে যেতে হচ্ছে তার ঠিক নেই। জান মা, তোমাদের জামাই মা-বোনকে আনার পর আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। আমার দিকে তেমন খেয়াল করে না। আমাশার কথা বলে একবার আসতে বললাম, বলল কিনা সময় কোথায়? মাকে নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকতে হয়।

তাই নাকি? কই, এতদিন তো তুই এসব কথা বলিসনি। আমি আর তোর বাবা না হয় একদিন গিয়ে দেখে আসব।

স্বামী অফিস থেকে ফিরলে শাফিয়া বেগম তাকে বিলকিসের শাশুড়ীর অসুখের কথা বললেন।

রকিব সাহেব বললেন, একদিন বিলকিসকে নিয়ে আমরা দেখে আসি চল।

শাফিয়া বেগম বললেন, বিলকিসের শরীর ভালো না। তার যাওয়ার দরকার নেই।

রকিব সাহেব কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বললেন ঠিক আছে, কাল বিকেলে যাওয়া যাবে।

পরের দিন রকিব সাহেব স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বিয়ানকে দেখে এসে বিলকিসকে বললেন, তোর যাওয়া উচিত ছিল। তার অবস্থা তেমন ভালো নয়। তোকে দেখতে চাইলেন। তোর মা হাফিজকে আসতে বলেছে। কিন্তু তার সে সময় কোথায়? মায়ের কাছে রাত জেগে জেগে অনেক রোগা হয়ে গেছে।

বাবার কথা শুনে স্বামীর প্রতি বিলকিসের সহানুভূতির পরিবর্তে রাগ হল। ভাবল, আমার অসুখের কথা শুনে দু'এক ঘণ্টার জন্যেও আসতে পারল না। কিছু না বলে বাবার কাছ থেকে চলে গেল। রাগে স্বামীকে ফোন করল না। যেদিন হাসানের বিয়ে সেদিন থেকে সবুরা বানুর অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেল। হাফিজ কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে সব সময় মায়ের কাছে রইল। বিয়ের দিন সায়রা ক্লিনিকে এসে হাফিজকে বলল, তুমি বিয়েতে যাবে না ভাইয়া? না গেলে তোমার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা কি ভাববে? আমি আম্মার কাছে থাকছি, তুমি যাও।

হাফিজ বলল, তুই পাগল হয়েছিস? আম্মার এই অবস্থা, কখন কি হয় বলা যায় না। তারা যাই ভাবুক আমি যাব না। আম্মা আগে, না বিয়ে আগে?

জামাই বিয়েতে এল না দেখে রকিব সাহেব চিন্তিত হলেন। পরের দিন অফিসে ফোন করে জানতে পারলেন, হাফিজ ছুটিতে আছে। শুনে চিন্তাটা আরও বেড়ে গেল। ভাবলেন, তা হলে কি বিয়ান সাহেবার অবস্থা ভালো নয়?

দু'দিন পর সবুরা বানুর সিরিয়াস পিরিয়ড কেটে যাওয়ার পর হাফিজ শ্বশুর বাড়িতে ফোন করল।

ইশিতা ফোন ধরে সালাম দিয়ে বলল, কি খবর দুলাভাই, আপনি এলেন না যে? আপা আপনার উপর খুব রেগে আছে।

হাফিজ সালামের উত্তর দিয়ে বলল, গত দু'দিন আম্মার অবস্থা খুব খারাপ গেছে। তাই যেতে পারিনি। তোমার আপাকে একটু দাও। ধরুণ বলে ইশিতা রিসিভার টেবিলের উপর রেখে আপার কাছে গিয়ে বলল, দুলাভাইয়ের ফোন এসেছে, তোমাকে ডাকছে।

বিলকিস এসে রিসিভার তুলে বলল, না এসে এভাবে আমাকে অপমান করতে পারলে?

হাফিজ সালাম দিয়ে বলল, এতে অপমান হবার কি আছে? মানুষের বিপদ আপদ হতে পারে না? গত দু'দিন আম্মার অবস্থা খুব সিরিয়াস গেছে।

বিলকিস সালামের উত্তর দিয়ে বলল, একটা ফোন করেও জানাতে পারতে, না, জানাবার দারকার মনে করনি?

তুমি আমাকে ভুল বুঝছ কেন? আম্মার অবস্থা দেখে আমার কোনো কিছু মনে ছিল না।

এখন বোধ হয় আম্মার সে অবস্থা কেটে গেছে? কখন আসছ?

কাল এক ফাঁকে যাওয়ার চেষ্টা করব।

কেন, আজ এলে কি হয়?

আজ পারব না।

ঠিক আছে, এখন তা হলে রাখি?

হাফিজ রাখ বলে সালাম জানাল।

বিলকিস হাফিজের 'রাখ' বলার সাথে সাথে রিসিভার রেখে দিয়েছে, তাই সালামের উত্তর সে পেল না। বুঝতে পারল, তার উপর বিলকিস খুব রেগে আছে।

পরের দিন হাফিজ যখন শ্বশুরের বাসায় পৌঁছাল ইশিতা তখন কলেজে। হাসানও নেই, শ্বশুর বাড়ি গেছে।

রকিব সাহেব ড্রইংরুমে ছিলেন। হাফিজ ঢুকে সালাম দিয়ে কদবুসি করে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন?

রকিব সাহেব সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, ভালো। তোমার মা এখন কেমন আছেন?

হাফিজ বলল, গতকাল থেকে একটু ভালো। তার আগের দু'দিন খুব আশঙ্কাজনক অবস্থায় কেটেছে।

রকিব সাহেব বললেন, বিয়ের দিন তুমি এলে না দেখে আমরা সেই রকম মনে করেছিলাম। পরের দিন তোমার অফিসে ফোন করে জানলাম, তুমি ছুটি নিয়েছ। যাক, তোমার মা ভালো আছেন জেনে স্বস্তি বোধ করছি। যাও, ভিতরে যাও।

শাফিয়া বেগম আয়ার মুখে জামাই এসেছে শুনে ড্রইংরুমে এলেন।

হাফিজ তাকেও সালাম দিয়ে কদমবুসি করল।

শাফিয়া বেগম সালামের উত্তর দিয়ে দো'য়া করে বললেন, তুমি ঐদিন এলে না বলে আমরা খুব চিন্তায় ছিলাম।

হাফিজ কিছু বলার আগে রকিব সাহেব বললেন, আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম না, বিয়ান সাহেবার নিশ্চয় বাড়াবাড়ি কিছু হয়েছে?

শাফিয়া বেগম 'এস বাবা ভিতরে এস' বলে চলে গেলেন।

হাফিজ জানে বিলকিস কোন রুমে থাকে। সেখানে গিয়ে বিলকিসকে দেখে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছ?

বিলকিস অভিমানের সুরে সালামের উত্তর দিয়ে বলল, আমার ভালোমন্দ শোনার তোমার দরকার নেই। তোমরা ভালো থাকলেই হল।

হাফিজ তার কথা শুনে মনে ব্যথা পেয়ে বলল, তুমি আমার উপর রাগ বা অভিমান করতে পার, তাই বলে আম্মাকে এর মধ্যে টানছ কেন? সে সব কিছুর উর্ধ্বে। যাক, তবু আমি তোমার প্রতি অন্যায় করেছি। সে জন্যে ক্ষমা চাইছি বলে দুটো হাত জড়ো করল।

হাফিজকে ক্ষমা চাইতে দেখে বিলকিসের রাগ-অভিমান দূর হয়ে গেল। তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমিও ভুল করেছি, মাফ করে দাও।

হাফিজ তাকে আদর দিয়ে বলল, কেমন আছ বলবে না?

আগের থেকে ভালো।

তা হলে আজ আমার সঙ্গে চল।

ইশিতা কলেজ থেকে ফিরে দুলাভাই এসেছে শুনে বই-খাতা হাতে নিয়েই আপার রুমের দরজার কাছে এসে বলল, আপা আসতে পারি?

বিলকিস স্বামীকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়ে বলল, আয়।

ইশিতা পারমিশান চাওয়ার পর পর্দা ঠেলে ঢুকেছে। তাই আপাকে দুলাভাইয়ের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হতে দেখেছে। বলল, কি দুলাভাই, আমি এসে বোধ হয় আপনাদের ডিস্টার্ব করে ফেললাম।

হাফিজ বলল, ডিস্টার্ব হবে কেন? এখন কি আর সেদিন আছে?

ইশিতা বলল, এক বছরের মধ্যেই দিন শেষ হয়ে গেল? আমি তো মনে করেছিলাম, আপনারা সারা জীবন রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকবেন।

বিলকিস এগিয়ে এসে তার পিঠে একটা আদরের চড় মেরে বলল, আপাকে নিয়ে ফাজলামি করছিস? যত বড় হচ্ছিস, দিন দিন তত বেশি ফাজিল হয়ে যাচ্ছিস। যা, বেরো এখান থেকে।

ইশিতা কপট অভিমানের সুরে বলল, দেখছেন দুলাভাই, আপা আপনার সামনে আমাকে অপমান করল। আর আপনি একমাত্র শ্যালিকার হয়ে কিছু প্রতিকার করলেন না। ঠিক আছে, আমি আর কোনো দিন আপনাদের সঙ্গে কথা বলব না। কথা শেষ করে সে চলে যাওয়ার ভান করে চলে যেতে লাগল।

হাফিজ তার কপটতা বুঝতে পারল না। বলল, যুদ্ধে পিঠ দেখান কাপুরুষের লক্ষণ।

কথাটা শুনে ইশিতা দাঁড়িয়ে পড়ল।

তাই দেখে হাফিজ বিলকিসকে বলল, ওর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করা তোমার উচিত হয়নি।

বিলকিস ইশিতার কপটতা ধরে ফেলেছে। বলল, তুমি ওর ভনিতা বুঝতে পারনি। ওকে কি আমি জোরে মেরেছি। না ও সত্যি সত্যি যাবে?

ইশিতা হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বলল, তা দুলাভাই, আপার রাগ অভিমান ভাঙাতে পেরেছেন তো?

বিলকিস বলল, আবার ফাজলামি করছিস?

ইশিতা বলল, কথা বললেই যদি ফাজলামি হয়, তা হলে চললাম। তোমার হাতে মার খাওয়ার চেয়ে অন্য কিছু খেলে পেট ভরবে। তারপর যেতে যেতে বলল, চলি দুলাভাই, বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে।

ইশিতা চলে যাওয়ার পর হাফিজ বলল, ওর বয়সের তুলনায় স্বাস্থ্য যেমন হয়েছে তেমনি জ্ঞানের দিক দিয়েও বেশ পাকা হয়ে উঠেছে।

বিলকিস বলল, তুমি দেরিতে বুঝলেও আমি অনেক আগে বুঝেছি। ও অনেক আউট বই পড়ে। তাই অকালে পেকে গেছে।

হাফিজ বলল, ওর কথা থাক, এখন বল আমার সঙ্গে যাবে কিনা?

বিলকিস বলল, তুমি আজ না এলেও দু'একদিনের মধ্যে যেতাম। ভাইয়া ফিরে আসুক তারপর যাব। নচেৎ সে মনে কষ্ট পাবে। ভাইয়া যাওয়ার সময় সে কথা বলে গেছে।

হাফিজ বলল, ঠিক আছে, তুমি তা হলে ভাইয়াকে সাথে করে নিয়ে এস। আমাকে কাল থেকে অফিস করতে হবে।

হাসানের মামাশ্বশুর তাকে দেশের বাড়ি ময়মনসিংহ বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাই তার ফিরতে চার-পাঁচদিন দেরি হল। ফিরে এসে হাফিজের আসার কথা শুনে

এবং বিলকিস তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলে হাসান বাবাকে বলল, বিলকিসের জন্যে যে সব আসবাব পত্র অর্ডার দেয়া হয়েছিল, সেগুলো এই সাথে নিয়ে গেলে হত না?

রকিব সাহেব বললেন, হ্যাঁ। আমিও সেকথা ভেবেছি।

হাফিজ শ্বশুরবাড়ি থেকে ঘুরে আসার এক সপ্তাহ পর হাসান ট্রাক ভাড়া করে খাট ও খাটের সাজ, স্টীলের আলমারী, এক সেট ডাইনিং টেবিল-চেয়ার, শোকেস, ওয়ার্ডরব, ড্রেসিং টেবিল, স্টীলের মিটসেফ, ফ্রীজ, বিশ ইঞ্চি রঙিন টেলিভিশন, একটা টেপরেকর্ড ও সংসারের অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে নিজেদের গাড়িতে বিলকিস ও ইশিতাকে সাথে করে জয়দেবপুরে এল।

হাফিজ তখনও অফিস থেকে ফেরেনি। আর সায়রা ক্লিনিকে মায়ের কাছে। শুধু নতুন কাজের মেয়েটা বাসায় ছিল।

বিলকিস একটা নতুন কাজের মেয়েকে বাসায় দেখে বলল, তুমি আবার কবে থেকে আছ? আগের মেয়েটা কোথায়?

কাজের মেয়েটা বলল, সে চলে যেতে সাহেব আমাকে রেখেছে। আজ পাঁচদিন হল আমি আছি।

বিলকিস তাকে দিয়ে সব ঘরদোর পরিস্কার করিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করতে বলল। তারপর তিন ভাইবোন পরামর্শ করে ট্রাকের হেলপারদের সাহায্যে সব কিছু জায়গা মতো সাজিয়ে রাখল। যখন তাদের সাজান-গোছান শেষ হল তখন বেলা তিনটে।

বিলকিস কাজের মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল, এখনও সাহেব ফিরছে না কেন?

কাজের মহিলার নাম মর্জিনা। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। অল্প দূরে তাদের ঘর। স্বামী নেই। মারা গেছে। এক ছেলে। সে রিকশা চালায়। বিয়ে করেছে। বৌটা শাশুড়ীকে দেখতে পারে না। বলে অমন মোষের মত গতর নিয়ে বসে বসে খেতে শরম করে না। কত মেয়ে লোকের বাড়ি কাজ করে, তুমি পার না? ছেলেটা ম্যাগের ভেড়ুয়া। সুন্দরী যুবতী বৌ যা বলে তা মেনে নেয়। বৌ যে মাকে ভালো করে খেতে দেয় না, যা-তা করে বলে, সেসব জেনেও কিছু বলতে সাহস করে না। তাই মর্জিনা তিন-চারটে দোকানে ছুটো কাজ করত। হাফিজের কাজের মেয়েটা চলে যাওয়ার পর খুব অসুবিধে হচ্ছিল। একদিন এক দোকানদারকে কাজের মেয়ের কথা বলতে সে মর্জিনাকে ঠিক করে দেয়।

মর্জিনা বিলকিসের কথা শুনে বুঝতে পেরেছে, ইনি বেগম সাহেব। বলল, সাহেব অফিস থেকে তার মায়ের কাছে যান। সেখান থেকে আপাকে সঙ্গে করে বাসায় এসে খেয়েদেয়ে আবার চলে যান। সাহেব ফিরতে আরও ঘন্টাখানেক দেরি হবে।

বিলকিস ভাইয়া ও ইশিতাকে বলল, শুনলে তো? তার জন্যে অপেক্ষা করার দরকার নেই, আমরা খেয়ে নিই, এস। আমার শরীরটা খারাপ লাগছে।

হাসান বলল, তাই খেয়ে নিই আয়। তুই খেয়েদেয়ে একটু ঘুমা। অনেক পরিশ্রম করেছিস।

হাফিজ সায়রাকে নিয়ে যখন ফিরল তখন বেলা সাড়ে চারটে। বাসায় ঢুকে সব কিছু দেখে ভাইবোন একে অপরের দিকে নির্বাক হয়ে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইল।

মর্জিনা দরজা খুলে তাদেরকে ঐভাবে থাকতে দেখে বলল, বেগম সাহেব এই সমস্ত জিনিস সঙ্গে করে এনেছেন।

হাফিজ বলল, ঠিক আছে, তুমি খাবার তৈরি কর, আমরা হাতমুখ ধুয়ে আসছি। হাফিজের ফ্ল্যাটে মোট চারটে রুম ও দু'টো বাথরুম। একটা ড্রইং রুম, দু'টো বেডরুম, একটা কিচেন রুম। কিচেন রুমটা বেশ বড়। হাফিজ হার্ডবোর্ডের পার্টিশান দিয়ে ডাইনিং রুম বানিয়েছে। বিল্ডিংটা চারতলা। ওরা দোতলার ফ্ল্যাটে থাকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডান দিকের ফ্ল্যাটটা ওদের। ফ্ল্যাটে ঢোকার প্রথম রুমটা ড্রইং রুম। ড্রইংরুমের সঙ্গে এটাচ বাথরুম। ঐ রুমের পাশ দিয়ে ভিতরে যাওয়ার চার ফুট চওড়া বারান্দা। বারান্দায় বেরোবার দরজা আছে, বারান্দাটা পনের ফুট লম্বা। বারান্দার দু'পাশে দুটো বেডরুম। আর শেষ প্রান্তে কিচেন ও ডাইনিং রুম। ডাইনিং রুমের পাশে আর একটা বাথরুম আছে। সেটা ডানদিকের বেডরুমের সঙ্গে এটাচ। দু'দিক থেকে বাথরুমগুলোতে যাওয়া যায়। প্রত্যেক ফ্লাটের দক্ষিণ দিকে বার ফুট বাই আট ফুট আর একটা বারান্দা আছে। সেগুলো লোহার গ্রীল দিয়ে ঘেরা।

হাফিজ ড্রইং রুমের দিকে তাকিয়ে দেখল, আগের চেয়ার-টেবিলের বদলে নতুন গদিওয়ালা সোফা সেট। দক্ষিণ দিকের জানালার কাছে একটা সিঙ্গেল খাট, তাতে হাসান নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। এই রুমে ফ্যান ছিল না। একটা নতুন মিল্লাত ডিলাক্স ফ্যান ফুল স্পীডে ঘুরছে। সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বোনকে বলল, কাপড় পাল্টে হাতমুখ ধুয়ে আয়, খাবি।

সায়রা মায়ের সঙ্গে ডান দিকের রুমে থাকে। তারা একটা তক্তপোসে ঘুমাতো। রুমে ঢুকে দেখল, সেটা নেই। ভাইয়ার রুমের খাটটা রয়েছে। জানালা দিয়ে বারান্দার দিকে তাকাতে দেখতে পেল, সেখানে আগের সব আসবাবপত্র রয়েছে। কাপড় পাল্টে হাতমুখ ধুয়ে ডাইনিং রুমে এসে ভাইয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

হাফিজ বেডরুমে ঢুকে দেখল, নতুন খাটে নতুন বিছানায় দু'বোন ঘুমাচ্ছে। রুমের এক সাইডে ড্রেস চেঞ্জ করার জন্য স্ট্রাণ্ডের সঙ্গে দামী কাপড়ের পর্দা দিয়ে পার্টিশান করা হয়েছে। তার পাশে ব্যবহৃত কাপড় নতুন আলনায় রয়েছে। ইশিতার দিকে তাকাতে দেখতে পেল, তার পায়ের কাপড় কিছুটা উঠে গেছে। বুকের কাপড়ও সরে গেছে। তাড়াতাড়ি রুম থেকে বেরিয়ে এসে মর্জিনাকে ডেকে বলল, ওদেরকে জাগিয়ে বল আমরা এসেছি।

মর্জিনা ঘরে ঢুকে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তাদেরকে জাগিয়ে সাহেবের ফেরার কথা জানাল।

ইশিতা জেগে নিজের গায়ের কাপড়ের দিকে লক্ষ্য করে মর্জিনাকে জিজ্ঞেস করল, দুলাভাই এই রুমে এসেছিল নাকি?

মর্জিনা বয়স্ক মেয়ে। সেও ঐ অবস্থায় ইশিতাকে দেখেছে। তার কথা শুনে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে একটু ঘুরিয়ে বলল, এদিকে আসতে দেখেছিলাম। তবে ভিতরে ঢুকেছিলেন কিনা জানি না। আমি ডাইনিং রুমে খাবার তৈরি করছিলাম। সাহেব এসে আপনাদের জাগাতে বললেন।

ইশিতার দৃঢ় ধারণা হল, দুলাভাই রুমে ঢুকে তাকে বিবস্ত্র দেখে ফিরে গিয়ে কাজের মেয়েটাকে জাগাতে পাঠিয়েছে। কথাটা ভেবে সে খুব লজ্জা পেল। হাফিজ কাপড় পাল্টাবে বলে একটু পরে রুমে ঢুকে সালাম দিয়ে বলল, তোমরা কেমন আছ? কখন এলে?

বিলকিস সালামের উত্তর দিয়ে বলল, আমরা ভালো আছি। দশটার দিকে এসেছি। তারপর আবার বলল, এভাবে খাওয়া-দাওয়া করলে শরীর টিকবে? মর্জিনার কাছে শুনলাম ফিরতে তোমার দেরি হয়। এত দেরি করে প্রত্যেক দিনে ফিরো নাকি?

হাফিজ পার্টিশনের আড়ালে গিয়ে কাপড় চেঞ্জ করতে করতে বলল, প্রতিদিন দেরি হয়, কিন্তু এত দেরি হয় না। তারপর বাথরুম থেকে মুখ-হাত ধুয়ে এসে ইশিতার লজ্জারাঙা মুখ দেখে কারণটা অনুমান করতে পারল। বলল, ইশিতা তুমি উঠলে কেন? আরও কিছুক্ষণ ঘুমোতে পারতে?

ইশিতা আরও লজ্জা পেয়ে কিছু না বলে চুপ করে রইল।

খাওয়া-দাওয়ার পর তারা সবাই যখন ক্লিনিকে এল তখন প্রায় ছ'টা বাজে। সবুরা বানুকে দেখে হাসান ইশিতাকে নিয়ে চলে গেল।

বিলকিস সবুরা বানুকে সালাম করে বলল, আমার শরীর খারাপ ছিল বলে আসতে পারিনি।

সবুরা বানু অনেকটা সুস্থ হয়েছেন। সবাইকে আসতে দেখে উঠে বসেছিলেন। বৌয়ের মাথায় চুমো খেয়ে বললেন, সে কথা হাফিজের কাছে শুনেছি।

হাফিজ মাগরিবের নামায পড়ে এসে বিলকিস ও সায়রাকে বাসায় যাওয়ার জন্য একটা বেবী ঠিক করে তাদেরকে উঠতে বলল।

বিলকিস তাকে জিজ্ঞেস করল, রাতে তুমি কোথায় খাও?

হোটেলে।

প্রত্যেক দিন হোটেলে খেলে গ্যাস্টিক হবে না?

হলে কি আর করা যাবে। যদি আল্লাহপাকের ইচ্ছা হয় হবে, তাই বলে আম্মাকে একা ফেলে রেখে চলে যেতে পারি না।

বাসা থেকে খেয়ে আবার আসতে পার।

তা পারি। তবে গাড়ির এত ঝাঁকুনি সহ্য করতে বেশ কষ্ট হয়।

বিলকিস আর কিছু না বলে সায়রাকে নিয়ে বেবীতে উঠল।

আরও পনের দিন পর সবুরা বানু সুস্থ হলে হাফিজ তাকে বাসায় নিয়ে এল।

ছেলেমেয়ের মতো তিনিও খুব অবাক হলেন। এক সময় ছেলেকে ডেকে বললেন, এত সব কেনার কি দরকার ছিল? আমাদের গ্রামে একবার অনেক বড় মিলাদের মাহফিল হয়েছিল। সেখানে অনেক মৌলবীরা ওয়াজ করেছিলেন। আমাকে তোর আব্বা নিয়ে গিয়ে মেয়েদের বসার জায়গায় রেখে পুরুষদের জায়গায় চলে গিয়েছিল। মাহফিল শেষে আবার সঙ্গে করে ঘরে নিয়ে আসে। সেদিন একজন মৌলবীকে বলতে শুনেছিলাম, আল্লাহপাক কুরান শরীফে বলেছেন, 'জীবন ধারণের জন্য যতটুকু দরকার তার অতিরিক্ত খরচ করা নিষেধ। যারা দরকারের অতিরিক্ত খরচ

করে তারা শয়তানের ভাই।' তাদেরকে তিনি পছন্দ করেন না। আগে তোর যা কিছু ছিল, তাতেই তো চলে যাচ্ছিল। শুধু শুধু এত দামী জিনিস কিনতে গেলি কেন?

হাফিজ বলল, তুমি মৌলবীর মুখে কুরআন পাকের যে কথা শুনেছ তা আমিও জানি। এসব জিনিস আমি কিনিনি। আমার শ্বশুর দিয়েছেন।

সবুরা বানু বললেন, তাই বল। শুধু শুধু তোকে দোষ দিলাম।

এতদিন হাফিজ ক্লিনিকে মায়ের কাছে থাকত বলে বিলকিস টেপে গান শুনেছে। টিভির প্রোগ্রাম দেখেছে। আজ হাফিজ বাসায় আছে, তাই টেপ চালায়নি। সে এশার নামায পড়তে মসজিদে চলে গেলে বিলকিস টিভি খুলে আটটার সংবাদ শুনতে লাগল। সায়রা পড়ছিল। তাকে এক সময় ডেকে নিয়ে এল।

সায়রা নিজের ইচ্ছায় ভাবির রুমে কোনো সময় যায় না। ভাবি ডাকলে যায়। ভাইয়া যতদিন বাসায় থাকত না, ততদিন ভাবির ডাকে প্রতিদিন টিভিতে খবর শুনেছে। তার জেদাজেদিতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাটক দেখেছে। আজ ভাইয়া আছে, তাই এ রুমে আসার ইচ্ছা তার ছিল না। কিন্তু ভাবির ডাকে না এসে পারল না। খবর হয়ে যেতে বলল, ভাবি, আমি এবার পড়তে যাই।

বিলকিস বলল, বস না, পরে পড়ো। আজ ভালো নাটক আছে দেখবে। সায়রা বাধ্য হয়ে নাটক দেখতে লাগল।

হাফিজ নামায পড়ে এসে টিভি চলার শব্দ শুনে ড্রইংরুমে বসে চিন্তা করতে লাগল, তার এখন কি করা কর্তব্য। একদিকে ইসলামের বিধি নিষেধ, অপরদিকে স্ত্রী। তখন তার একটা হাদিস মনে পড়ল, 'নারী জাতিকে আল্লাহপাক বাঁকা হাড় দিয়ে তৈরি করেছেন। তাই তাদের স্বভাব-চরিত্র একটু বাঁকা। স্বামীরা যেন জোর জবরদস্তি করে সোজা করতে না যায়, বাঁকা হাড় সোজা হয় না। জোরজবরদস্তি করলে ভেঙে যাবে। সেই জন্য তাদেরকে সৎ উপদেশ দিয়ে ধর্মের পথে আনার চেষ্টা করবে। আর তাদের দৈনিক ছোট ছোট শত অপরাধ ক্ষমার চোখে দেখবে। হাদিসটা স্মরণ হতে মায়ের কাছে গিয়ে ঘড়ি দেখে তাকে ওষুধ খাওয়াল। তারপর তার পায়ে হাত বুলোতে লাগল। সায়রার বই টেবিলের উপর দেখে বুঝতে পারল, সেও টিভি দেখছে। তাই তার কথা আম্মাকে জিজ্ঞেস করল না।

সবুরা বানু ছেলের মুখের অবস্থা দেখে বুঝতে পারলেন, ছেলে ঐসব পছন্দ করে না বলে মন খারাপ। বললেন, কি আর করবি বাবা, বৌমাকে কুরআন হাদিসের কথা বলে ঐসব না দেখার জন্য বুঝিয়ে বলবি।

হাফিজ বলল, তুমি ওসব নিয়ে কোনো কথা তোমার বৌয়ের সঙ্গে বলো না। যা বলার আমি বলব।

নাটক হয়ে যেতে সায়রা ফিরে এলে হাফিজ তাকে বলল, কি রে টিভি দেখছিলি বুঝি? মায়ের অসুখের জন্যে তোর অনেক পড়ার ক্ষতি হয়েছে। আবার এখন টিভি দেখে সময় নষ্ট করছিস। আর কোনোদিন টিভি দেখবি না। এশার নামায পড়েছিস? তাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? না পড়ে থাকলে যা অযু করে নামায পড়ে পড়তে বস। সায়রা চলে যেতে বিলকিস টিভি বন্ধ করে তার

পিছু পিছু এসে দরজার বাইরে হাফিজ কি বলে শোনার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। নামায পড়ে ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে সে বুঝতে পেরেছিল হাফিজ নিশ্চয় মায়ের রুমে আছে। সায়রাকে বকছে শুনে ভিতরে এসে বলল, তুমি ওকে বকছ কেন? ও তো টিভি দেখতে যায়নি, আমি ওকে ডেকে নিয়ে গেছি।

হাফিজ বলল, ওসব কথা থাক। আম্মাকে খাওয়ান হয়েছে?

বিলকিস বলল, আটটার আগে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বললেন, পরে খাবেন। এখনই নিয়ে আসছি।

আম্মার খাওয়া হয়ে যেতে হাফিজ এ ঘরে এসে বলল, আমরা এবার খেয়ে নেই চল।

সায়রা অযু করে মায়ের রুমের একপাশে নামায পড়ছিল। বিলকিস সেখানে গিয়ে তাকে সালাম ফিরাতে দেখে বলল, নামায পড়ে তুমিও চলে এস খাবে। খেয়েদেয়ে পড়তে বসো।

খাওয়া-দাওয়ার পর বিলকিস হাফিজকে বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

কর।

বাবা এইসব দিয়েছে, তুমি খুশি হওনি?

তোমার তাই মনে হচ্ছে বুঝি?

আমার যাই মনে হোক না কেন, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

দেখ বিলকিস, খুশি জিনিসটা অন্তরের ব্যাপার। আর তাই সবাই এক রকম জিনিসের উপর খুশি হয় না। যেমন কেউ নভেল-নাটক পড়ে খুশি হয়। আবার কেউ ধর্মীয় বই পড়ে খুশি হয়।

তা হলে বোঝা যাচ্ছে, তুমি খুশি হওনি।

তাই যদি তুমি ভাব, তা হলে তাই।

কিন্তু কেন, জানতে চাই। প্রত্যেক বাবা-মা তাদের সামর্থ অনুযায়ী বিয়ের সময় অথবা পরে মেয়েকে এই সব দিয়ে থাকে। আমার বাবা-মাও দিয়েছেন। এতে তোমার অখুশি হবার কি কারণ থাকতে পারে বুঝতে পারছি না।

তোমার মা-বাবা তোমাকে সোনা-দানা, আসবাবপত্র যা কিছু দিয়েছেন তাতে আমি খুশি না অখুশি হয়েছি তা বলব না। তবে টেপ ও টিভির জন্যে অসন্তুষ্ট হয়েছি।

বিলকিস একটু রেগে গিয়ে বলল, তোমাকে একদিন সিনেমা দেখবার কথা বলতে কুরআন-হাদিসের কথা বলে নিষেধ করেছিলে। ঘরে বসে একটু আধটু গান শুনব, নাটক দেখব, তাতে তোমার মতো শিক্ষিত ছেলের আপত্তি থাকা উচিত নয়।

হাফিজ বলল, কি উচিত আর অনুচিত সে জ্ঞান আল্লাহপাক আমাকে দিয়েছেন। তুমি স্কুল-কলেজের পাঠ্যবই পড়েছ শুধু পরীক্ষায় পাস করার জন্য, জ্ঞান আহরণ করার জন্য পড়নি। আর ধর্মীয় কোনো বই পড়েছ বলে মনে হয় না। তাই উচিত অনুচিতের কথা বলছ। যদি ঐসব বই জ্ঞান আহরণের জন্যে পড়তে, তা হলে ঐ সমস্ত কথা বলে তর্ক করতে না। তুমি ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে পড়ছ। উত্তেজিত হওয়া তোমার এখন বিপদজনক। তাই যা বলছি মাথা ঠাণ্ডা করে শোন। মনে রেখ, যা বলব তা আমার নিজের কথা নয়, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের (দঃ) কথা। তবে সেগুলো বোঝাবার জন্য

না। এটাকে ভাঙিয়ে লকেটসহ চেন বানিয়ে আন। আমি তার গলায় পরিয়ে দিয়ে কোলে নেব। লকেটে তোর মেয়ের নাম 'আফিয়া ওয়াসিমা' মনে করে লিখিয়ে নিবি।

হাফিজ ঢুলনিটা মায়ের হাতে ফেরত দিয়ে বলল, এটা এখন রেখে দাও। আব্বার হাতের জিনিস ভাঙার দরকার নেই। তোমার নাতনি বাসায় এলে তার গলায় পরিয়ে দিও। আচ্ছা আম্মা, এত নাম থাকতে ঐ রকম বেখাপ্পা নাম রাখতে চাচ্ছ কেন?

সবুরা বানু বললেন, তুই তা হলে ঐ নামের অর্থ জানিস না। ঐ নামের অর্থ হল, পুণ্যবতী সুন্দরী। তোর আব্বার খুব শখ ছিল, আর একটা মেয়ে হলে তার ঐ নাম রাখার। তোর আব্বার কাছে ঐ নামের অর্থ জেনেছিলাম।

হাফিজ মায়ের কথামতো একদিন একটা বড় খাসী নিয়ে মাকে ও বোনকে সঙ্গে করে শ্বশুর বাড়িতে মেয়ের আকীকা করার জন্য এল। আসার সময় হাফিজ একটা দেড় ভরী ওজনের লকেটসহ সোনার চেন মায়ের হাতে দিয়ে বলেছিল– এটা গলায় পরিয়ে দিয়ে তোমার নাতনিকে কোলে নিও। সে আম্মাকে খুশি করার জন্য তার দেয়া নাম রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে লকেটে নামটা মনে করে লিখিয়েছে।

সবুরা বানু নাতনিকে কোলে নিয়ে চেনটা গলায় পরিয়ে দিয়ে আদর করতে করতে বললেন, আমি আমার বোনের নাম 'আফিয়া ওয়াসিমা' রাখলাম। তারপর বিয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি অন্য কোনো নাম রেখেছেন?

শাফিয়া বেগম বললেন, আমরা ওর নাম সুগন্ধা রেখেছি।

সবুরা বানু বললেন, ওটা না হয় ডাক নাম থাকবে।

সায়রা ভাইজীকে নিয়ে আদর করতে করতে ভাবিকে বলল, এবার চলুন না ভাবি, আর কতদিন এখানে থাকবেন?

সবুরা বানুও বিয়ানকে বললেন, আমি বৌমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

শাফিয়া বেগম বললেন, চল্লিশার ছুঁৎ যাওয়ার পর বিলকিস যাবে। ততদিন ওর শরীরটা সেরে উঠুক। আর নাতনিও একটু ফুটফুটে হোক।

আম্মা বলা সত্ত্বেও যখন বিলকিস থেকে গেল তখন হাফিজের স্ত্রীর উপর যেমন মনে কষ্ট হল তেমনি বেশ রেগে গেল। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ না করে সেদিন আকীকা করে পরের দিন সায়রা ও মাকে নিয়ে ফিরে এল।

এরপর হাফিজ আর গুলশান গেল না। ফোন করেও তাদের খবর নিল না। কয়েকদিন পর বিলকিস ফোন করে বলল, কি ব্যাপার একদম চুপচাপ যে? একটা খবর নেওয়ারও দরকার মনে করনি বুঝি?

হাফিজ মনের কষ্ট মনে চেপে রেখে বলল, অফিসে কাজের চাপ, সময় করে উঠতে পারছি না।

বিলকিস বলল, স্ত্রী ও মেয়ের চেয়ে কাজটা বড় হল?

হাফিজ বলল, আর তোমার কাছে স্বামী ও শাশুড়ীর চেয়ে বুঝি মা-বাবা বড় হল?

বিলকিস রেগেমেগে বলল, ঠিক আছে, কে কার কাছে বড় দেখা যাবে। তারপর সে ফোন ছেড়ে দিল।

বিলকিস অনেক দিন বাবা-মার কাছে থেকে স্বামীর মন বোঝার চেষ্টা করল না। তাকে ফোনে আসবার কথা বলতে হাফিজ যখন কাজের অজুহাত দেখিয়ে এল না তখন উল্টো তার উপর রেগে গেল। ভেবে ঠিক করল, হাফিজ নিয়ে যেতে না এলে, সেও যাবে না। আর তাকে ফোনও করবে না।

এভাবে আরও তিন-চার মাস পার হয়ে গেল। সবুরা বানু বাধ্য হয়ে মর্জিনার সাহায্যে সংসারের হাল ধরলেন। আর ছেলেকে বারবার বৌমাকে আনার জন্য তাগিদ দিতে লাগলেন।

হাফিজ একদিন মাকে বলল, আম্মা, তোমার বৌকে আনার জন্য আমি অনেকবার গেছি। তুমি নিজেও গেছ। সে আসেনি। সে বাবা-মার কাছে যতদিন থাকতে চায় থাকুক। যখন মন চাইবে তখন আসবে। আমি তাকে নিয়ে আসতে আর যাব না। সংসারের কাজের জন্য যদি তোমার আরও একজন কাজের মেয়ে দরকার হয়, তা হলে মর্জিনাকে বলে তার ব্যবস্থা করছি।

সবুরা বানু বললেন, মাত্র তিন-চারজনের রান্না খাওয়া। মর্জিনা রয়েছে, আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু ঘরের বৌ বাপের বাড়ি থাকবে এ কেমন কথা? আর লোকেই বা কি বলবে?

হাফিজ বলল, তোমাকে ওসব নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। যা কিছু করার আমি করব।

অফিসের সাহেব হাফিজকে অত্যন্ত ভালো নজরে দেখেন। তাকে অনেক বিষয়ে পরীক্ষা করে দোষ দেখতে পাননি। অন্যান্য স্টাফদের সঙ্গে হাফিজের অনেক তফাৎ লক্ষ্য করেছেন। তার সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠায় সাহেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট। তাই তাকে ম্যানেজার করার জন্য তিন বছরের বিজনেস ম্যানেজমেন্টের উপর ট্রেনিং দেয়ার জন্য লণ্ডন পাঠাবার মনস্থ করলেন। সে ব্যাপারে তিনি একদিন হাফিজের সঙ্গে আলাপ করে তার মতামত জানতে চাইলেন। হাফিজ মনে মনে আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করে ট্রেনিং-এ যাওয়ার মত প্রকাশ করল।

মাসখানের মধ্যে হাফিজের লণ্ডন যাওয়ার চূড়ান্ত ব্যবস্থা হয়ে গেল।

বিলকিসকে জামাই নিয়ে যেতে আসেনি এবং বিলকিসও যাচ্ছে না দেখে রকিব সাহেব একদিন মেয়েকে ডেকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন।

শাফিয়া বেগম সেখানে ছিলেন। মেয়ের হয়ে বললেন, এতদিন হয়ে গেল হাফিজ নিয়ে যেতে এল না। ও-ই বা নিজের ইচ্ছায় যাবে কেন?

রকিব সাহেব স্ত্রীকে বললেন, আমি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি। যাকে করেছি, সেই বলুক।

বিলকিস বলল, মা তো ঠিক কথাই বলেছে বাবা। সেই কবে এসেছিল। মেয়েকে দেখতে কি ইচ্ছা হয়নি? কথা শেষ করে চোখে আঁচল চাপা দিল।

রকিব সাহেব বুঝতে পারলেন, মেয়ে জামাইয়ের মধ্যে মান-অভিমান চলছে। বললেন, যে মেয়ে স্বামীর দোষ অন্বেষণ করে, সে সাংসারিক জীবনে কখনও সুখী হয় না। আমি হাফিজকে কাল টেলিফোন করব।

বিলকিস বলল, না বাবা, তা তুমি করতে পারবে না। আমি তোমাদের কাছে এতই কি গুরুভার হয়ে গেছি, আমাকে তাড়াবার জন্য তুমি ছোট হয়ে জামাইয়ের কাছে টেলিফোন করবে?

রকিব সাহেব হেসে উঠে বললেন, পাগল মেয়ের কথা শোন, জামাইকে টেলিফোন করলে ছোট হয়ে যাব কেন? শ্বশুর হয়ে খোঁজ নেয়া তো কর্তব্য। আর গুরুভারের কথা যে বললি, তাও ঠিক নয়। গাছ কখনও তার ফল বহন করতে গুরুভার বোধ করে না।

তবুও আমি তোমাকে ফোন করতে নিষেধ করব বাবা বলে বিলকিস সেখান থেকে চলে গেল।

রকিব সাহেব পরের দিন হাফিজকে ফোন করলেন। তাকে পাওয়া গেল না। যে ফোন ধরেছিল, সে বলল, উনি এখন সাহেবের রুমে খুব ব্যস্ত আছেন।

রকিব সাহেব বললেন ঠিক আছে, আমি আবার ফোন করব। পরে দু'তিন বার ফোন করে একই উত্তর পেয়ে ভেবে রাখলেন, আগামীকাল করবেন।

পরের দিনও হাফিজকে পেলেন না। গতকালের মতো উত্তর পেলেন। তৃতীয় দিন ফোন করতে লোকটা বলল, উনি একটু আগে সাহেবের সঙ্গে বেরিয়ে গেছেন। আপনার পরিচয়টা বলুন।

রকিব সাহেব বললেন, হাফিজ আমার জামাই।

লোকটা বলল, আপনি আজ দু'তিন দিন ফোন করছেন। কিছু বলার থাকলে বলুন।

রকিব সাহেব বললেন, বলবেন আমি ফোন করেছিলাম। তারপর তিনি ফোন ছেড়ে দিলেন।

লণ্ডন যাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাওয়ার পর হাফিজ এক সপ্তাহের ছুটি নিল। আজ প্রায় ছ'মাস হয়ে গেল বিলকিস বাবার বাসায় রয়েছে। কেউ কারো সঙ্গে যোগাযোগ করেনি বলে দু'জনের প্রতি দু'জনেরই প্রচণ্ড অভিমান। হাফিজের মন মেয়েকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। এতদিনে মেয়েটা হয়ত হামাগুড়ি দিতে শিখেছে। বিলকিসের ব্যবহার ও তার নীরবতা হাফিজের মনকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। মেয়েটা না হলে বিলকিসের সঙ্গে দেখা না করে লণ্ডন চলে যেত। মেয়েটাকে এক নজর দেখার জন্য এবং বিলকিসের কেন এত নীরবতা জানার জন্য সে গুলশানে যাওয়ার মনস্থির করে মাকে বলল, আম্মা আমাকে অফিস থেকে বিলেত পাঠাচ্ছে। ফিরতে আমার বছর তিনেক দেরি হবে। তোমরা একা এতদিন এই বাসায় থাকবে কি করে? আমি চিন্তা করেছি, তোমাদেরকে দেশের বাড়িতে রেখে আসব।

সবুরা বানু বললেন, কেন, বৌমা এখানে থাকবে না?

হাফিজ বলল, আমি আজ ওকে আনতে যাব। যদি আসে তা হলে কোনো কথা নেই। না এলে যা বললাম তাই করতে হবে।

সবুরা বানু বউয়ের ব্যবহারে খুব ক্ষুণ্ন হয়েছেন। তবু বললেন, তোর বিলেত যাওয়ার কথা শুনলে নিশ্চয় চলে আসবে।

সকালে নাশতা খেয়ে হাফিজ যখন গুলশানে শ্বশুরের বাসায় পৌছাল তখন বাসায় শাফিয়া বেগম ছাড়া কেউ নেই। সবাই হাসানের শ্বশুরবাড়িতে দাওয়াত খেতে গেছে।

হাসানের শালার আজ বৌ-ভাত। একেবারে রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরবে। হাফিজ শাশুড়ীকে বিলেত যাওয়ার কথা বলে বলল, ভাইয়ার শ্বশুর বাড়ির ফোন নাম্বার আছে?

শাফিয়া বেগম 'আছে' বলে ফোন নাম্বার এনে দিলেন।

হাফিজ ফোন করে বিলকিসকে চাইল।

বিলকিস ফোন ধরে বলল, আপনি কে? আমি বিলকিস বলছি।

আমি হাফিজ।

বিলকিসের অভিমান আরও বেড়ে গেল। সে চুপ করে রইল।

কি হল, কিছু বলছ না কেন?

তুমি আগে বল কেন ফোন করেছ?

কোম্পানি আমাকে লণ্ডন পাঠাচ্ছে। চারদিন পর আমার ফ্লাইট। তুমি এক্ষুনি আফিয়াকে নিয়ে চলে এস।

কোথায়?

আমি গুলশানের বাসা থেকে ফোন করেছি। তোমার অপেক্ষায় রইলাম। তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

এতদিন আসনি কেন?

কয়েকবার এসে বিফল হয়ে তারপর আর আসিনি। তুমিই বা চলে যাওনি কেন?

সে কৈফিয়ত এখন দেব না।

নাই দাও। কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি চলে এস।

না।

না কি?

আমি যাব না।

দেখ বিলকিস এখন তর্ক করার সময় না। যা বললাম কর।

বললাম তো যাব না।

এখন যাবে না। না কোনোকালেই যাবে না?

তোমার কি মনে হয়?

আমার কোনোটাই মনে হয় না। তুমি এক্ষুনি এখানে আসবে এবং আমি তোমাকে নিয়ে যাব– এটাই মনে হচ্ছে।

যদি তাই মনে হয়, তা হলে আজ তুমি থাকবে আর আমি রাতের খাওয়ার পর সকলের সঙ্গে আসছি।

হাফিজ ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেল। বেশ রাগের সঙ্গে বলল, তুমি আমাকে কি মনে কর?

একজন মানুষ।

শুধু তাই।

আর যা মনে করি এখন বলব না, রাতে গিয়ে বলব।

কিন্তু আমি তো এখানে থাকতে পারব না।

কেন? এতদিন পরে শ্বশুর বাড়িতে এলে, একটা রাত থাকতে পারবে না, এ কেমন কথা?

দেখ বিলকিস, তুমি কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি করছ। আমাকে আজ বিকেলে বিলেত যাওয়ার ব্যাপারে একজনের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। ওঁর ফ্লাইট আগামীকাল সকালে।

সেটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যপার, আমি কি বলব?

তুমি তা হলে আসবে না?

না।

এটাই কি তোমার শেষ কথা?

হ্যাঁ।

এর পরিণতি কি হবে ভেবেছ?

ভাববার কি আছে? যা হবার হবে।

একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

কর।

আমি যে বিদেশ যাচ্ছি, তা কি তোমার বিশ্বাস হয়?

হয়।

তবু আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছ?

ফিরিয়ে তো দিচ্ছি না, তোমাকে থাকতে বলছি।

থাকার যে কোনো উপায় নেই।

স্ত্রী ও মেয়ের জন্যে উপায় না থাকলেও তুমি থাকবে।

আমার অসুবিধেটা তুমি বুঝবে না?

তোমার যেমন অসুবিধা আছে, তেমনি এখন যাওয়া আমারও অসুবিধে আছে। মেয়েরা স্বামীর জন্য অনেক বড় বড় অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও সবকিছু করে।

তোমার কথা ঠিক। তবে আমার দ্বারা এখন তা করা সম্ভব হচ্ছে না।

তা হলে বাধ্য হয়ে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে।

থাকতে যখন একান্ত পারবে না তখন যাও।

এজন্য একদিন পস্তাতে হবে।

ভয় দেখাচ্ছ?

না, যা সত্যি তাই বললাম।

আমারটা আমি ভাবব, তোমাকে ভাবতে হবে না।

হাফিজ শেষ চেষ্টা করে বলল, দুপুরে খাওয়ার পর আসতে পারবে না, আমি অপেক্ষা করব?

বললাম না একেবারে রাতের খাওয়ার পর যাব।

হাফিজ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে রাখছি। আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করুন। ফোন ছেড়ে দিয়ে শাশুড়ীকে রুদমবুসি করে বলল, আম্মা আসি। কথা শেষ করে সে হনহন করে চলে গেল।

শাফিয়া বানু কিছু বলার সুযোগ পেলেন না। তার আগেই হাফিজ রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

হাফিজ ফিরে এসে মাকে বলল, তোমার বৌ আসবে না। কাল সকালে তোমাদেরকে দেশের বাড়িতে রেখে আসতে যাব।

সবুরা বানু ছেলের মন খারাপ দেখে বললেন, আমাকে একবার নিয়ে চল। আমি বৌমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে আসব। তোর মেয়েকে অনেক দিন দেখিনি। মনটা হু-হু করছে। আবার কবে তাকে দেখতে পাব তা আল্লাহ মালুম।

হাফিজ বলল, একবার তো নিয়ে আসতে গিয়েছিলে, কই-এসেছিল? সে আসবে না। এলে আমার সাথেই আসত।

সবুরা বানু চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বললেন, তুই আমার একমাত্র ছেলে। বৌ নিয়ে সুখে ঘর-সংসার করছিস দেখে আমি মরব। তোদের মধ্যে যে কি হল তা আল্লাহ জানেন?

হাফিজ বলল, মানুষ অনেক কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা করে। তার সব কি পূরণ হয়? দুঃখ না করে দো'য়া কর, আল্লাহ যেন তোমার ও আমার মনের আশা পূরণ করেন।

পরের দিন সকালে হাফিজ মা ও বোনকে দেশের বাড়িতে রেখে আসার জন্যে রওয়ানা দিল। দু'দিন পর ফিরে এসে লণ্ডন যাওয়ার দিন সকালে বিলকিসের মা-বাবা যেসব আসবাবপত্র দিয়েছিলেন, সেগুলো ট্রাকে করে অফিসের একজন পিয়নকে দিয়ে শ্বশুরের বাসায় পাঠিয়ে দিল। পিয়নের হাতে মালপত্রের একটা লিস্ট ও বিলকিসকে একটা চিঠি দিল। রওয়ানা হওয়ার আগে মর্জিনার হাতে চাবি দিয়ে বলল, তুমি প্রতিদিন এসে ঘর-দুয়ার পরিস্কার করে যাবে। প্রত্যেক মাসে পিয়ন তোমার ঘরে গিয়ে তোমার বেতন দিয়ে আসবে। হাফিজ দুপুরের ফ্লাইটে লণ্ডন চলে গেল।

সেদিন বিলকিস ফোন ছেড়ে দিয়ে ভেবেছিল, মা নিশ্চয় তার জামাইকে দুপুরে না খাইয়ে যেতে দেবে না। আর হাফিজ তো দুপুরের খাওয়ার পর চলে আসতে বলল। সেই কথা ভেবে সে দুপুরের খাওয়ার পর মেয়েকে নিয়ে তাদেরকে শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে ফিরে এল। এসে মায়ের কাছে হাফিজ তখনই চলে গেছে শুনে তার উপর আরও রেগে গেল। মাকে বলল, তোমার জামাইকে দুপুরে খেয়ে যেতে বলনি?

শাফিয়া বেগম বললেন, সে কথা বলার সুযোগ পাইনি। এসেই আমার কাছ থেকে নাম্বার নিয়ে তোকে ফোন করল। তারপর ফোন ছেড়ে দিয়ে আমাকে সালাম করে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

রাতে বাসায় ফিরে রকিব সাহেব স্ত্রীর কাছে জামাইয়ের কথা শুনে বিলকিসকে ডেকে অনেক রাগারাগি করে বললেন, তোর একগুঁয়েমি এখনও গেল না। জামাই তোকে ফোন করে ডেকে পাঠাল, আর তুই এলি না? সে বিদেশ যাচ্ছে, কতদিন পর ফিরবে সে কথা জিজ্ঞেস করেছিলি?

বিলকিস বলল, না, জিজ্ঞেস করিনি। বাবা তুমি শুধু আমার একগুঁয়েমি দেখলে, হাফিজের কি কোনো দোষ নেই?

রকিব সাহেব বললেন, মানুষের দোষ-গুণ থাকবেই। তাই বলে কোনো মেয়েরই উচিত নয়, স্বামীর দোষের জন্য তাকে দূরে ঠেলে দেয়া। তবে হ্যাঁ, স্বামী যদি অন্যায়ভাবে স্ত্রীর উপর অত্যাচার করে, মদ খায়, কু-পথে টাকাপয়সা নষ্ট করে, তা

হলে আলাদা কথা। আমি তো হাফিজের মধ্যে সে সব কিছু দেখিনি। তবু যে কেন তুই তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছিস ঠিক বুঝতে পারছি না।

বিলকিস বলল, তার ঐসব দোষ না থাকলেও সে ভীষণ গোঁড়া। সিনেমা দেখে না, গান শুনে না, টিভি দেখে না। তোমরা টিভি-টেপ দিয়েছ বলে আমাকে একদিন অনেক কথা শুনিয়েছে। আর সে আমার অসুখের সময় একবারও আমাকে দেখতে আসেনি। অথচ ক্লিনিকে মায়ের কাছে দিন-রাত ছিল। তার মন বলে যদি কিছু থাকত, তা হলে মেয়েকে একবারও দেখতে আসেনি কেন? আজই বা এসে চলে গেল কেন?

মেয়ের ছেলেমানুষি বুদ্ধি দেখে রকিব সাহেবের রাগ পড়ে গেল। নরম সুরে বললেন, তুই গ্র্যাজুয়েশন নিয়েছিস কিন্তু তোর জ্ঞান একদম হয়নি। হাফিজের যে দোষগুলোর কথা বললি, আমার কাছে সেগুলো তার মহৎ গুণ বলে মনে হচ্ছে। যাকগে, যা হবার হয়েছে। কাল তুই সকালে ড্রাইভারকে নিয়ে জয়দেবপুরে চলে যা। অফিসে গিয়ে আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব।

পরের দিন বেলা এগারটার সময় বিলকিস ড্রাইভাররের সঙ্গে জয়দেবপুরে এল। বাসায় তালা দেখে পাশের ফ্ল্যাটে যারা থাকে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, হাফিজ মা ও বোনকে নিয়ে দেশের বাড়ি গেছে। বিলকিস আর কি করবে, বাধ্য হয়ে ফিরে এসে বাবাকে কথাটা জানাল।

রকিব সাহেব বললেন, কবে তার ফ্লাইটের কথা বলেছিল?

বিলকিস বলল, চারদিন পর।

রকিব সাহেব হিসাব করে বললেন, পরশু ড্রাইভার পাঠিয়ে খবর নেব, দেশ থেকে ফিরেছে কিনা। তারপর তুই যাস।

ঐদিন ড্রাইভার গিয়ে ফিরে এসে বলল, উনি দেশ থেকে ফিরেন নি।

পরের দিন বিলকিস যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল, এমন সময় বাসার সব মালপত্র ট্রাকে করে পিয়নকে দিয়ে হাফিজ পাঠিয়ে দিয়েছে শুনে ড্রইংরুমে এল।

পিয়ন তাকে বলল, হাফিজ সাহেবের স্ত্রীর একটা চিঠি আছে।

বিলকিস বলল, ঠিক আছে, আমাকে দিন।

পিয়ন তার হাতে চিঠিটা দেয়ার আগে বলল, উনি কিন্তু চিঠিটা ওনার স্ত্রীকে দিতে বলেছেন।

বিলকিস বলল, আমি ওনার স্ত্রী। তারপর চিঠিটা নিয়ে আয়াকে ডেকে পিয়নকে চা-নাশতা দিতে বলে ভিতরে চলে গেল। নিজের রুমে এসে সীল করা খাম খুলে চিঠিটা বের করে পড়তে লাগল।

বিলকিস,

পত্রে আমার আন্তরিক দো'য়া ও ভালোবাসা নিও। আর কলিজার টুকরো আফিয়া ওয়াসিমার প্রতি রইল হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে দো'য়া ও স্নেহ চুম্বন। পরে জানাই যে, তোমার কাছ থেকে এ রকম ব্যবহার আশা করিনি। আমার কি মনে হচ্ছে জান, তোমাকে বিয়ে করে বিরাট ভুল করেছি। তুমি সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছ। ঐশ্বর্যের জৌলুসে মানুষ হয়েছ। তোমাকে সুখী করার মতো আমার কিছু নেই। তবু

তোমাকে ভালোবেসে বিয়ে করে মনে করেছিলাম, কিছু না থাকলেও প্রেম দিয়ে তোমাকে সুখী করব। তাতেও আমি অকৃতকার্য হলাম। হয়ত এটাই নিয়তি। তা না হলে তুমি আমাকে জানার ও বোঝার চেষ্টা না করে দীর্ঘদিন মা-বাবার কাছে থেকে গেলে কেন? অনেকবার তোমাকে আনতে গেছি, বারবার ফিরিয়ে দিয়ে অবহেলা দেখিয়েছে। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে মনে হল, তুমি আমাকে গোঁড়া ভাব। আর আমি আমার আম্মাকে বেশি মেনে চলি। ভক্তিশ্রদ্ধা করি; সব সময় তার সেবা-যত্ন করি বলে তুমি ভাব মা আসার পর থেকে তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা শিথিল হয়ে গেছে। তুমি বাবা ও ভাইয়ার কাছে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা খেয়ে সহ্য করতে না পেরে যে প্রেমিকের কাছে রাতের অন্ধকারে চলে এসেছিলে, যাকে তুমি প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসতে, যে তোমার চির আকাঙ্ক্ষিত ধন ছিল, তাকে তুমি এত সামান্য কারণে দূরে সরিয়ে দিয়ে আগের জীবনে ফিরে যেতে চাইবে তা এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি আমার কাঙ্ক্ষিত জীবন মাত্র কয়েক দিনের জন্য পেয়েছিলাম। ভাগ্যে নেই বলে হয়ত বেশি দিন ভোগ করতে পারলাম না। তাই তোমার ব্যাপারটা বুকে সেল হানলেও সহ্য করতে পেরেছি। কিন্তু আমার মেয়েকে না দেখে বিদেশ যাত্রার জ্বালা এবং আমার মায়ের প্রতি তোমার কর্তব্যে অবহলো আমার মনে গভীর ক্ষত তৈরি করেছে। আল্লাহ জানেন সেই ক্ষত কবে ভালো হবে। তোমাকে তোমার বাবা-মা যেসব জিসিনপত্র দিয়েছিলেন সেগুলো পাঠিয়ে দিলাম। দেশে যাওয়ার সময় আম্মা তার নাতনিকে এক নজর দেখবে বলে এবং তোমাকে নিয়ে এসে আমাদের মিলমিশ করিয়ে দেবে বলে আমাকে বলেছিল। আমি আম্মার কথা জীবনে এই প্রাথম অমান্য করে তাকে যেতে দিইনি। কারণ আম্মা একবার তার নাতনিকে দেখতে ও তোমাকে নিয়ে আসতে গিয়েছিল। তুমি তো এলেই না, এমন কি আম্মার সঙ্গে তুমি ভালো করে কথা পর্যন্ত বলনি। তাকে ভালোমন্দ জিজ্ঞেসও করনি। এতে করে কি আম্মাকে ও আমাকে তোমাদের বাসার সকলের কাছে অপমান করা হল না? আম্মাকে শয্যাশায়ী দেখেও বাবা-মার সঙ্গে চলে গেলে। তার কঠিন অসুখের সময় একদিনও তাকে দেখতে আসনি, এগুলো কি আমার মনে ব্যথা দেয়নি? স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর যত্রতত্র যাতায়াত করা উচিত নয়। বোরখা কিনে দিয়ে তোমাকে বোরখা পরে বাইরে যাতায়াত করতে বলছি। সে কথা তুমি শোননি। টেপ ও টিভিতে নাচ-গান দেখতে-শুনতে নিষেধ করেছি। সে কথাও তুমি গ্রাহ্য করনি। নামাযের প্রতি গরুত্ব দেয়ার কথা অনেকবার বুঝিয়ে বলেছি। তবু বারবার তুমি নামাযে গাফিলতি করেছ। এতকিছু করার পরও আমি তোমার সঙ্গে কোনো রকম অসদাচরণ না করে আল্লাহপাকের কাছে সব সময় তোমার হেদায়েত কামনা করেছি। এখনও করি, আর যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন করে যাব। আমি শুধু তোমার দোষগুলো বললাম বলে মনে কিছু করো না। কেন বললাম জান? মানুষ অনেক সময় নিজের দোষ ধরতে পারে না। আমার ক্ষেত্রে তাই যদি হয়, তা হলে সেগুলো ধরিয়ে দেয়া তোমার উচিত ছিল। তা হলে আমি সংশোধন করার চেষ্টা করতাম। যাক, বেশি কিছু লিখে তোমাকে আর বিরক্ত করব না। আর একটা কথা বলে শেষ করব। আমি তোমাকে বিধি-নিষেধের যে কথাগুলো বলেছি তা আমার নিজের কথা নয়, আল্লাহপাকের ও তাঁর রসুল পাকের (দঃ)-এর কথা।

আল্লাহপাকের দরবারে তোমার ও আফিয়ার সর্বাঙ্গীন কুশল ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ কামনা করে এবং আমাকে তোমাকে তথা সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে যেন তিনি হেদায়েত দান করেন সেই দো'য়া চেয়ে শেষ করছি। 'আল্লাহ হাফেজ।'

ইতি–
হাফিজ।

পুনশ্চঃ এই চিঠি যখন পড়বে তখন আমি হয়ত প্লেনে থাকব। কবে ফিরব এবং তোমার ও আফিয়ার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে তা আল্লাহপাক জানেন।

চিঠি পড়ে বিলকিস নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনায় তার চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল। এক সময় বিছানায় শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ইশিতা সব কিছু দেখে শুনে বিলকিসের কাছে এসে তাকে ঐ অবস্থায় দেখে তার গায়ে হাত দিয়ে আপা বলে ডাকল।

বিলকিস উঠে বসে ভিজে গলায় বলল, তোর মতো বুদ্ধি থাকলে আমার এই অবস্থা হত না। তারপর চিঠিটা তার হাতে দিয়ে বলল, আমি নিজে নিজের কত বড় সর্বনাশ করেছি পড়ে দেখ।

ইশিতা চিঠি পড়ে বলল, আমি কিছু বললে তখন তো খুব বকাবকি করতে, এখন আর কান্নাকাটি করে কি হবে? ধৈর্য ধরে নিজেকে স্বামীর মতো করে গড়ার চেষ্টা কর। আমি তোমাকে আগেও যা বলেছি এখনও তাই বলব, স্বামী আপটুডেট হোক আর গোঁড়া ধার্মিক হোক, স্ত্রীর উচিত তাকেও স্বামীর মতো হতে হবে। নচেৎ দাম্পত্য জীবনে কোনোদিন সুখ-শান্তি আসবে না। তারপর সে আপার কাছ থেকে চলে গেল।

হাফিজের চিঠি পড়ে ও ইশিতার কথা শুনে বিলকিসের পরিবর্তন শুরু হল। ক্বুরআন হাদিসে কি লেখা আছে তা জানার জন্য মার্কেট থেকে নানান রকম ধর্মীয় বই, ক্বুরআন-হাদিসের বাংলা অনুবাদ কিনে এনে পড়তে লাগল। যত পড়তে লাগল তত মনের মধ্যে এক অনাবিল শান্তি অনুভবের সাথে সাথে সে সব মেনে চলার প্রেরণাও অনুভব করল। উম্মুল মুমেনিন (রাঃ) দের ও মা ফাতেমার (রাঃ) এবং বিবি রহিমার জীবনী ও তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর গভীর সম্পর্কের কথা পড়ে চোখে পানি রাখতে পারল না। সাহাবী (রাঃ) ও মহিলা সাহাবী (রাঃ)-দের জীবনী পড়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। এই সব বই পড়ার সময় তার হাফিজের কথা মনে পড়ে চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠে। ভাবে, এই জন্যেই সে এই সব বই পড়তে বলেছিল। তার একটা কথা বারবার মনে পড়ে "অশ্লীল বই পুস্তক পড়ে, সিনেমা-টিভি দেখে এবং গান-বাজনা শুনে যতটা না চিত্তবিনোদন হয়, এই রকম ধর্মীয় বই পড়লে ও ক্বুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যা পড়লে এবং আল্লাহপাকের সৃষ্ট অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে তার চেয়ে অনেক বেশি চিত্তবিনোদন হয়।" এভাবে যত দিন যেতে লাগল তত সে ধর্মের সব কিছু মেনে চলতে লাগল। বোরখা ছাড়া কোথাও বের হয় না। পাঁচ ওয়াক্ত নামায তো দূরের কথা, আউওয়াবীন, তাহাজ্জুদ, এশরাক ও চাশতের নামায পর্যন্ত পড়তে শুরু করল। টেপ-টিভির ধারে-কাছে যেতেও তার ইচ্ছে করে না। তবে রেডিওতে খবর শুনে। বিভিন্ন

দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়ে। আর দিনের পর দিন আল্লাহপাকের কাছে মনের কামনা জানিয়ে স্বামীর চিঠির অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকে।

হাসানের স্ত্রী সীমা ননদের কাণ্ড দেখে একদিন তাকে বলল, কি ভাই, তুমি যে দেখছি দিন দিন তাপসী রাবেয়ার মতো হয়ে যাচ্ছ।

ততদিনে বিলকিস ধর্মের অনেক কিছু জেনেছে। ভাবির কথা শুনে বলল, মুসলিম মনীষী ও মনীষাদের নামের শেষে (রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওআলাইহা), পুরুষ ও নারী সাহাবাদের নামের শেষে (রদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও আনহা), নবী ও ফিরিশতাদের নামের শেষে (আলাই হিস সালাম) বলতে হয়। আর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ এর নামের শেষে (সাল্লাল্লাহ আলাই হিস সালাম) বলা একান্ত কর্তব্য। নচেৎ গুণাহ হবে।

সীমা বলল, আমি ভাই এত কিছু জানি না। এবার থেকে বলব।

হাফিজ মা-বোনকে নিয়মিতো চিঠি দেয়। কিন্তু বিলকিসকে দেয় না। লণ্ডনে পৌছে শুধু শ্বশুরকে একটা চিঠিতে ভালোভাবে পৌঁছানোর কথা কয়েক ছত্রে লিখে জানিয়েছিল। কিন্তু তাকে তার ঠিকানা দেয়নি। বিলকিস হাফিজের দেশের বাড়ির ঠিকানা জানে। সায়রা যখন আম্মার কথা চিঠি লিখে জানিয়েছিল তখন সেই খাম থেকে ঠিকানা লিখে রেখেছিল। হাফিজের চিঠির অপেক্ষায় থাকতে থাকতে যখন এক বছর পার হয়ে গেল তখন সে সায়রাকে চিঠি দেয়ার মনস্থ করল। চিঠি লিখে পোস্ট করতে যাওয়ার জন্যে গেট থেকে বেরিয়ে পিয়নের সঙ্গে দেখা।

পিয়ন বিলকিসকে চিনে। বলল, আপনার চিঠি।

বিলকিস পিয়নের কাছে থেকে চিঠিটা নিয়ে দেখল, সায়রা দিয়েছে, চিঠি পোস্ট করতে না গিয়ে রুমে এসে পড়তে লাগল–

ভাবি,

পত্রে আমার সালাম নিবেন। মাওই আম্মা ও তালই আব্বার পাক কদমে আমার সালাম দেবেন। ইশিতা আপাকে সালাম ও ভালোবাসা দু'টোই দেবেন। আর বাসার অন্যান্য সবাইকে ছোট-বড় হিসেব আন্তরিক দো'য়া ও সালাম জানাবেন। আর মামনি আফিয়া ওয়ামিসমার প্রতি রইল আমার আন্তরিক দো'য়া ও স্নেহচুম্বন। আম্মা আপনাদের বাসার সবাইকে দো'য়া জানিয়েছে। আশা করি, আল্লাহর ফজলে আফিয়া ওয়াসিমাসহ সকলে ভালো আছেন। আমরা তাঁরই দয়ায় এক রকম আছি। ভাইয়ার চিঠি পড়ে বুঝতে পারলাম সে আপনাকে চিঠি দেয়নি। আপনাদের বাসার ঠিকানা জানতাম না বলে এতদিন চিঠি দিতে পারিনি। আম্মা আপনার জন্যে ও আফিয়ার জন্যে প্রায়ই কাঁদে। আমাকে চিঠি দিয়ে খবর নিতে বলে। ভাইয়া চিঠিতে যখন আপনার ও আফিয়ার খবর জানতে চাইল তখন আমি তাকে আপনার ঠিকানা জানাবার কথা বলি। এবারের চিঠিতে আপনার ঠিকানা পেয়ে এই চিঠি লিখলাম। ভাইয়া আপনাকে তার ঠিকানা দিতে নিষেধ করেছে বলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দিতে পারলাম না। সে জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন। আপানারা কে কেমন আছেন অতি সত্ত্বর জানাবেন। আপনার

চিঠি পাওয়ার পর আমি ভাইয়াকে চিঠি দেব। বিশেষ আর কি লিখব, আপনার চিঠির আশায় রইলাম। আল্লাহ হাফেজ।

ইতি–
আপনার ছোট বোন
সায়রা।

হাফিজের চিঠি না পেয়ে বিলকিসের মনে যে আগুন জ্বলছিল, সায়রার চিঠি পেয়ে তা না নিভলেও তার তাপ কিছুটা কমল। তখনই আগের চিঠিটা ছিড়ে ফেলে আবার লিখতে বসল।

স্নেহের সায়রা,

পত্রে আমার আন্তরিক দো'য়া ও ভালোবাসা নিও। আর আম্মার পাক কদমে এই গোনাহগারের সালাম দিও। পরে জানাই যে, তোমার পত্র পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমাকে আর আপনি করে বলবে না। ভাবিকে আপনি করে বললে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়। এবার থেকে তুমি বলে কাছে টেনে নিও। আমার ব্যবহারে তোমরা সবাই অনেক দুঃখ পেয়েছ। সে জন্যে আমি খুব অনুতপ্ত। আমি জানি, তোমার ভাইয়া তোমাকে তার মতো করে গড়েছে। তাই আশা করব, তুমি আমার ভুলগুলো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে আপন করে নেবে। আম্মার মনেও অনেক কষ্ট দিয়েছি। ওঁর পাক কদমে এখন সালাম জানিয়ে ক্ষমা চাইছি। আল্লাহ যখন সুযোগ দেবেন তখন ওঁর পাক কদম জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইব। তোমার ভাইয়া আমাকে তার ঠিকানা দিতে নিষেধ করেছে। তার কথা তুমি পালন করেছ জেনে খুব খুশি হলাম। ভবিষ্যতে স্বামীর কথা সব সময় পালন করবে। আমার দুর্ভাগ্য যদি তোমার ভাইয়ার কথা মেনে চলতাম, তা হলে আজ আমি অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হতাম না। তোমার ভাইয়াকে জানিও বাসার সকলের সঙ্গে আমি ও আফিয়া ওয়াসিমা ভালো আছি। মাঝে মাঝে পত্র দিয়ে তোমাদের সকলের খবর জানালে খুশি হব। কোনো রকম অসুবিধায় পড়লে অথবা আম্মার শরীর বেশি খারাপ হলে অতি সত্ত্বর জানাবে। আর একটা কথা, আমাকে যদি ভাবি বলে মনে করে থাক, তা হলে আমার একটা অনুরোধ তোমাকে রাখতেই হবে। আমাদের সব খবর তোমার ভাইয়াকে জানালেও এই পত্র পেয়ে আমাকে যতটা বুঝেছ, তা জানাবে না। আশা করি, ভাইয়ার মতো ভাবির কথাটাও রাখবে। আল্লাহপাকের দরবারে তোমার ও আম্মার সহিসালামতের জন্যে দো'য়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।

ইতি–
তোমার ভাবি
বিলকিস।

ভাবির চিঠি পড়ে সায়রা খুব খুশি হল। বুঝতে পারল সে তার ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনায় ভুগছে। মায়ের কাছে এসে বলল, আম্মা, ভাবি চিঠি দিয়েছে। সে ও

আফিয়া ওয়াসিমা ভালো আছে। তাদের বাসার অন্যান্য সবাই ভালো আছে। ভাবি তোমার পায়ে সালাম দিয়ে ক্ষমা চেয়েছে।

সবুরা বানু বললেন, কই চিঠিটা পড় তো শুনি। সায়রা পড়ে শুনাতে শোকর আলহামদু লিল্লাহ বলে বললেন, আল্লাহ আমার দো'য়া কবুল করেছেন। প্রত্যেক নামাযের পর বৌমাকে হোদয়েত করার জন্য আল্লাহর দরবারে দো'য়া করতাম। তুই তোর ভাইয়াকে বৌমা ও আফিয়া ওয়াসিমা ভালো আছে জানিয়ে বৌমার পরিবর্তনের কথা জানাবি। আর আমার কথা বলে বৌকে চিঠি দিতে বলবি।

সায়রা ভাইয়াকে চিঠি লিখে সব কিছু জানালেও ভাবির কথা রাখার জন্য তার অনুশোচনার কথা জানাল না।

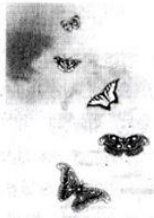

বিলকিস বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে জয়দেবপুরের বাসায় থাকার সিদ্ধান্ত নিল। একদিন ড্রাইভারের সঙ্গে গাড়ি নিয়ে জয়দেবপুরে এসে দেখল মর্জিনা বাসা পরিস্কার করছে।

বিলকিসকে দেখে মর্জিনা এগিয়ে এসে বলল, বেগম সাহেবা কেমন আছেন?

বিলকিস তাকে সালাম দিয়ে বলল, ভালো। তারপর জিজ্ঞেস করল, তুমি কি রোজ এসে বাসা পরিস্কার করে চলে যাও, না এখানে থাক?

মর্জিনা বেগম সাহেবাকে সালাম দিতে শুনে যেমন খুব অবাক হল তেমনি লজ্জা পেল। সালামের উত্তর দিয়ে বলল, আমি এখানে থাকি না। সাহেব যাওয়ার সময় শুধু আমাকে রোজ ঘরদোর পরিস্কার করার কথা বলে চাবি দিয়ে গেছেন।

বিলকিস বলল, ঠিক আছে আমি বসছি। পরিস্কার করা হয়ে গেলে চাবি আমাকে দেবে। আমি কাল থেকে এখানে থাকব। তুমিও আমার সঙ্গে থাকবে।

মর্জিনা বলল আপনি বসুন, আমি হাতের কাজ সেরে চা করে আনছি। বিলকিস সব রুম ঘুরে দেখল, আগের সব আসবাবপত্র গোছান-সাজান রয়েছে।

মর্জিনা চা করে নিয়ে এসে বেগম সাহেবাকে দিয়ে বলল, কাল কখন আসবেন?

বিলকিস বলল, দশটা-এগারটার দিকে। তুমি দশটার সময় আসবে।

মর্জিনা বলল, জি আসব।

পরের দিন বিলকিস মেয়েকে নিয়ে জয়দেবপুরে চলে এল। কয়েকদিন পর সে সায়রাকে চিঠি দিয়ে এখানে থাকার কথা জানিয়ে আম্মাকে নিয়ে চলে আসতে বলল। আরও জানাল, যদি আম্মাকে নিয়ে আসা তার পক্ষে সম্ভব না হয়ে তা হলে চিঠি দিয়ে জানাতে।

সায়রা চিঠির উত্তরে জানাল, তার পক্ষে আম্মাকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

সায়রার চিঠি পেয়ে বিলকিস একদিন গুলশানে গিয়ে বাবার কাছে শাশুড়ী ও ননদকে নিয়ে আসার কথা বলে গাড়ি চাইল।

রকিব সাহেব মেয়ে ভুল বুঝতে পেরেছে সে কথা আগেই জেনেছেন এবং তার পরিবর্তন দেখে খুব খুশি হয়েছেন। সেইজন্যে বিলকিস যখন স্বামীর বাসায় গিয়ে থাকতে চেয়েছিল তখন হৃষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছিলেন। এখন শাশুড়ী ও ননদকে নিয়ে আসবে শুনে আরও খুশি হয়ে বললেন, খুব ভালো কথা বলেছিস। যেদিন যাবি তার আগের দিন খবর দিস, আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব।

তিন দিন পর বাবাকে ফোন করে গাড়ি আনিয়ে বিলকিস ড্রাইভারের সঙ্গে রংপুর রওয়ানা দিল। রংপুরে পৌছে লোকজনকে জিজ্ঞেস করে যখন স্বামীর বাড়িতে পৌঁছাল তখন আসরের নামাযের ওয়াক্ত প্রায় শেষ। তাড়াতাড়ি শাশুড়ীকে কদমবুসি করে নামায পড়ল। নামায পড়ে রুমের বাইরে এসে দেখল, শাশুড়ী বারান্দায় নামাযপাটিতে বসে আফিয়াকে বুকে জড়িয়ে চুমো খাচ্ছেন আর তার দু'গাল বেয়ে চোখের পানি পড়ছে। সায়রাও পাশে দাঁড়িয়ে চোখের পানি ফেলছে।

বিলকিস শাশুড়ীর কাছে বসে তার পায়ে হাত রেখে ছলছল চোখে বলল, আম্মা, আপনি আমাকে মাফ করে দিন। অজ্ঞতার কারণে আমি আপনার সঙ্গে অনেক খারাপ ব্যবহার করেছি। বলুন, মাফ করে দিয়েছেন?

সবুরা বানু বৌমার চিঠিতে তার পরিবর্তনের কথা মেয়ের মুখে শুনেছেন। এখন তার প্রমাণ পেয়ে খুশিতে গদগদকণ্ঠে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। তারপর আফিয়াকে সায়রাকে ধরতে বলে বিলকিসকে জড়িয়ে ধরে মাথায় চুমো খেয়ে বললেন, বেঁচে থাক মা, সুখে থাক। তোমরা ছেলেমানুষ। ভুল-ত্রুটি তোমাদের হবে। তোমার উপর মনে কষ্ট না নিয়ে তোমাদের দু'জনের সুখ-শান্তির জন্য আল্লাহর কাছে দো'য়া চাইতাম। তিনি আমার মনের আশা পূরণ করেছেন। এখন যদি হাফিজ থাকত, তা হলে কতই না ভালো হত? দো'য়া করি, আল্লাহ যেন সেদিন তাড়াতাড়ি আমাকে দেখান।

আফিয়া আম্মু আম্মু করে তার কোলে যাওয়ার জন্য কান্না জুড়ে দিল।

সায়রা বলল, ভাবি, তুমি আফিয়াকে নাও। মাগরিবের নামায পড়ার সময় চলে যাচ্ছে।

নামায পড়ে সায়রা ভাবিকে বলল, তুমি আফিয়াকে নিয়ে আম্মার কাছে বস, আমি রান্নার জোগাড় করি। তার আগে চা-মুড়ি দিচ্ছি।

বিলকিস বলল, ড্রাইভারের ব্যবস্থা কি করবে? গাড়িটাও অত দূরে রাস্তার মোড়ে রয়েছে।

সায়রা বলল, গাড়ি ওখানেই থাকুক, কোনো অসুবিধে নেই। আর আমি ঘাটে অযু করতে যাওয়ার সময় চাচাকে ড্রাইভারের কথা বলেছি। ড্রাইভার সদরে চাচার কাছে ঘুমাবে। সে সেখানে আছে, কারো হাতে চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বিলকিস বলল, বাহ, তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। এরই মধ্যে ড্রাইভারের কথা চিন্তা করে ব্যবস্থা করে ফেলেছ।

বিলকিস সেখানে একদিন থেকে শাশুড়ী ও ননদকে নিয়ে জয়দেবপুরে ফিরে এল।

দেশে এসে সায়রা ভাইয়ার ব্যবস্থামতো ক্লাস টেনে ভর্তি হয়ে পরীক্ষা দিয়েছে। এখনও রেজাল্ট বেরোই নি। জয়দেবপুরে আসার এক মাস পর রেজাল্ট বেরোল। সে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে। বিলকিস তাকে কলেজে ভর্তি করে দিল।

সবুরা বানু ও সায়রা এবারে এসে বিলকিসের সব কিছু দেখে শুনে তাকে আপন করে নিল। বিলকিসও তাদেরকে আপন মা-বোনের মতো দেখতে লাগল। আফিয়া তো দাদিকে ছাড়তেই চায় না। এমন কি রাতেও দাদির কাছে ঘুমায়। এক ঘুমের পর যখন দুধ খাওয়ার জন্য কাঁদে তখন বিলকিস তাকে নিজের কাছে নিয়ে আসে। আফিয়া এখন বেশ ফুটফুটে হয়েছে। দেখতে খুব সুন্দর। গুড়গুড় করে হাঁটে। আব্বু, আম্মু, দাদি, ফুফু এবং আরও অনেক কথা বলতে শিখেছে। সারাদিন এঘর-ওঘর বারান্দায় ছুটে বেড়ায়। বিলকিস অনেক রকম খেলনা কিনে দিয়েছে, সেগুলো নিয়ে দাদির সঙ্গে খেলা করে।

জয়দেবপুরে আসার কিছুদিন পর ভাবির কথামতো সায়রা ভাইয়াকে চিঠি লিখল।

ভাইয়া,

আমার শতকোটি সালাম নিবে। আশা করি, আল্লাহপাকের রহমতে তুমি ভালো আছ। তাঁরই দয়ায় আমরা ভালো আছি। ভাবি ও আফিয়া ভালো আছে। আফিয়া হাঁটতে ও কথা বলতে পারে। পরীক্ষার পর থেকে আমরা জয়দেবপুরের বাসায় এসেছি। এবার থেকে এখানে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। তুমি কবে ফিরবে অতি অবশ্যই জানাবে। আম্মা তোমাকে দো'য়া বলে দিয়েছে। তোমার জন্য আম্মা কত কাঁদে। আমারও মন খারাপ হয়ে আছে। তাড়াতাড়ি ফিরে আসার চেষ্টা করবে। তোমার শ্বশুর বাড়ির সবাই ভালো আছে। বিশেষ আর কি লিখব, তোমার পত্রের আশায় রইলাম।

ইতি–

তোমার স্নেহের বোন

সায়রা।

হাফিজ সায়রার চিঠি পেয়ে যেমন খুশি হল, তেমনি স্ত্রী ও মেয়ের কথা চিন্তা করে মনটা খারাপ হয়ে গেল। উত্তরে জানাল, তার ফিরতে আরও এক বছর দেরি হবে। ভাবি নিষেধ করেছিল বলে সায়রা তার ও আফিয়ার এখানে থাকার কথা লিখেনি। তাই হাফিজ তাদের জয়দেবপুরে থাকার কথা জানতে পারল না। আফিয়া হাঁটতে ও অনেক কথা বলতে পারে জেনে ভাবল, আম্মা হয়ত সায়রাকে নিয়ে গুলশানে গিয়েছিল। তাই তাদের খবর লিখেছে।

হাফিজের তিন বছরের কোর্স শেষ হওয়ার পর সাহেব তাকে লণ্ডনে নিজের ফার্মে এক বছর কাজ করিয়ে এক্সপোর্ট করালেন। তারপর এখনাকার অফিসের ম্যানেজার পদে জয়েন করার জন্যে ফিরে আসতে বললেন।

চার বছর পর হাফিজ আজ বিকেল পাঁচটায় জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে এসে প্লেন থেকে নামল। আসার কথা আগে সায়রাকে জানিয়েছে। চার-পাঁচ বছরের একটা মেয়ের হাত ধরে একজন বোরখাপরা মহিলাকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মহিলা মুখের নেকাবটা পেঁচিয়ে নাকের উপর দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে রেখেছে। চোখে রঙিন চশমা। হাফিজ তার দিকে তাকিয়ে চিনতে না পেরে বাচ্চা মেয়েটার দিকে তাকাতে খুব চেনাচেনা বলে তার মনে হল। কয়েক সেকেণ্ড তার দিকে তাকিয়ে থেকে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার উপক্রম করলে বিলকিস সালাম দিয়ে বলল, কেমন আছ? তারপর আবার বলল, আমাকে না হয় চিনতে পারনি, তাই বলে নিজের মেয়েকেও চিনতে পারলে না?

হাফিজ নিজের চোখ-কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে বিলকিসের দিকে তাকিয়ে থেকে সালামের উত্তর দিয়ে বলল, আল্লাহপাকের অপার করুণায় ভালো আছি। তুমি?

বিলকিস চশমা খুলে বলল, আমিও সেই অপার করুণাময়ের করুণায় তোমার মতো আছি, যিনি তোমাকে রিসিভ করার জন্য আমকে এখানে আসার তওফিক এনায়েত করেছেন এবং তোমাকে ভালোভাবে ফিরিয়ে এনে তাঁর এক নাদান বান্দীর মনের বাসনা পূরণ করলেন। সেজন্যে তাঁর পাক দরবারে শতকোটি শুকরিয়া আদায় করছি।

হাফিজ বিলকিসকে দেখে ও তার কথা শুনে যেমন খুব অবাক হল তেমনি তার মন শান্তিতে ভরে গেল। তার দিকে একৃদষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ভাবল, নিশ্চয় আল্লাহপাক তার দো'য়া কবুল করে বিলকিসকে হেদায়েত দান করেছেন। মনে মনে তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে গিয়ে চোখে পানি এসে গেলে।

বিলকিস হাফিজকে ঐভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে এবং চোখে পানি দেখে তার চোখেও পানি এসে গেল। ভিজে গলায় মেয়েকে বলল, আফিয়া, ইনি তোমার আব্বু, সালাম দিয়ে কদমবুসি কর।

বিলকিস স্বামীকে রিসিভ করতে আসবে বলে আগের থেকে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে রেখেছিল। আসার সময় নিজে তৈরি হয়ে যখন মেয়েকে জামা-কাপড় পরাচ্ছিল তখন আফিয়া বলল, আমরা কি নানুদের বাসায় যাব?

বিলকিস বলল, না। আজ তোমার আব্বু বিলেত থেকে আসবে। তাকে আনার জন্যে আমরা এয়ারপোর্ট যাব।

আফিয়া বলল, এয়ারপোর্ট কি আম্মু?

যেখানে প্লেন ওঠানামা করে।

আব্বু এলে খুব মজা হবে, তাই না আম্মু? আমরা আব্বুর সঙ্গে কত জায়গায় বেড়াতে যাব, শিশুপার্কে যাব। তুমি বলেছ না, আব্বু এলে শিশু পার্কে বেড়াতে নিয়ে যাবে?

বিলকিসের চোখে পানি এসে গেল। চোখ মুছে বলল, হ্যাঁ সোনামনি। তোমার আব্বু এবার আমাদেরকে সব জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবে।

আফিয়া মায়ের চোখে পানি দেখে বলল, তুমি কাঁদছ কেন? আব্বু তো আজ আসছে, তুমি রোজ রাতের বেলা ঘুমাবার সময় কাঁদ। আর কাঁদবে না তো।

বিলকিস মেয়েকে বুকে জড়িয়ে সারা মুখে চুমো খেতে খেতে বলল, না মা, আর কাঁদব না। তারপর বেসিন থেকে চোখ-মুখ ধুয়ে এসে ঘড়ি দেখে মেয়েকে নিয়ে রওয়ানা হয়েছিল।

শিশু আফিয়া এতক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে একবার হাফিজের দিকে আর একবার আম্মুর দিকে তাকিয়ে দেখছিল। আম্মুর কথা শুনে বুঝতে পারল, এই লোকটা তার আব্বু। সালাম দিয়ে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এসে কদমবুসি করতে গেলে হাফিজ সালামের উত্তর দিয়ে তাকে বুকে তুলে নিয়ে সারা মুখে চুমো খেয়ে বলল, আল্লাহ তোমাকে হায়াতে তৈয়েবা দান করুন। তারপর বলল, তোমাকে এত আদর করলাম, আমাকে একটু করবে না?

আফিয়া আব্বুর দু'গালে দুটো চুমো খেয়ে বলল, এতদিন বুঝি বিলেতে থাকতে হয়? পাশের বাসার রুনুর আব্বা রুনুকে রোজ রোজ কত আদর করে। এবার তুমি আমাকে রোজ রোজ আদর করবে।

হাফিজ তার গালে অনেকগুলো চুমো খেয়ে বলল, হ্যাঁ মা, তাই করব। তারপর হাঁটতে হাঁটতে বিলকিসকে জিজ্ঞেস করল, আব্বা, আম্মা, ভাইয়া ও ইশিতা ভালো আছে?

বিলকিস বলল, আমি জয়দেবপুরে থাকি। তবে কয়েকদিন আগে আফিয়াকে নিয়ে গুলশানে গিয়েছিলাম। সবাই ভালো আছে।

কবে এসেছ?

প্রায় দু'বছর।

শুনে হাফিজ মনে হোঁচট খেল। বলল, কই সায়রা তো চিঠিতে কিছু জানায়নি?

আমি নিষেধ করেছিলাম।

কেন?

যে জন্যে তুমি সায়রাকে তোমার ঠিকানা আমাকে দিতে নিষেধ করেছিলে?

ততক্ষণে ওরা লাউঞ্জে চলে এসেছে। হাফিজ আফিয়াকে বুক থেকে নামিয়ে বলল, একটু অপেক্ষা কর, আমি লাগেজটা নিয়ে আসি।

কুলির মাথায় লাগেজ নিয়ে হাফিজ ফিরে এলে বিলকিস বলল, আমি ট্যাক্সি ভাড়া করে এসেছি।

ট্যাক্সিতে উঠে হাফিজ বলল, ইনশাল্লাহ এবার আমি কোম্পানির কাছ থেকে গাড়ি পাব।

আফিয়া বলে উঠল, তা হলে খুব মজা হবে। রোজ রোজে গাড়িতে করে আমরা বেড়াতে যাব। জান আব্বু, আম্মু আমাকে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যায় না, বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা বললে বলে, তোমার আব্বু আসুক তারপর সবাই একসঙ্গে বেড়াতে যাব। যেদিন খুব কাঁদি, সেদিন শুধু নানুদের বাসায় নিয়ে যায়।

হাফিজ মেয়েকে আদর করে বলল, তোমার আম্মু ঠিক কথা বলেছে। এবার আমি তোমাদেরকে নিয়ে বেড়াতে যাব।

এবার যখন বিলকিস জয়দেবপুরে আসে তখন রকিব সাহেব মেয়েকে তার আসবাবপত্র নিয়ে আসতে বলেছিলেন। বিলকিস বলেছিল, না বাবা, ওসবের কোনো দরকার নেই। আল্লাহ আমার তক্‌দিরে রাখলে সব কিছু হবে। রকিব সাহেব আর কিছু

বলেননি। ভাবলেন, টাকা-পয়সা বা জিনিসপত্র দিয়ে মেয়েকে সুখী করা যায় না। ভাগ্যে সুখ থাকলে মেয়ে সুখী হবে। বিলকিস সেই কথা ভাবছিল।

তাকে ভাবতে দেখে হাফিজ জিজ্ঞেস করল, আম্মা ও সায়রা কেমন আছে?

আল্লাহপাকের রহমতে ভালো আছে।

তাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে না কেন?

সঙ্গে নিয়ে এলে এভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারতাম না।

আম্মা ও সায়রা জয়দেবপুরে আসার খবর পেয়ে কি এসেছ?

না। আমি প্রথমে আসি। তারপর দেশে গিয়ে আম্মা ও সায়রাকে নিয়ে আসি।

হাফিজ বিলকিসের সঙ্গে যত কথা বলছে তত তার বিস্ময় বেড়ে যাচ্ছে। সে চুপ করে বেশ কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল।

বিলকিস বুঝতে পেরে বলল, অমন করে তাকিয়ে আছ কেন?

দেখছি।

কাকে?

আমার কাঙ্ক্ষিত জীবন সাথীকে।

কেমন দেখলে?

আল্লাহপাকের কাছে যেমন চেয়েছিলাম।

এমন সময় আফিয়া বলে উঠল, জান আব্বু, দাদি কত সুন্দর সুন্দর গল্প বলেন। হাতেম তাইয়ের গল্প, সোহরাব রুস্তমের গল্প, কাজীর বিচার, আরও কত রকম গল্প বলেন, আমি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি।

হাফিজ বলল, তাই নাকি?

আফিয়া বলল, হ্যাঁ আব্বু। আজ থেকে তুমিও আমার সঙ্গে গল্প শুনবে।

হাফিজ বলল, ঠিক আছে শুনব।

বাসায় পৌঁছে হাফিজ আম্মা বলে তার কাছে গিয়ে সালাম দিয়ে কদমবুসি করে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছ আম্মা?

সবুরা বানু ছেলেকে জড়িয়ে ধরে মাথায় চুমো খেয়ে দো'য়া করে বললেন, আল্লাহর ফজলে ভালো আছি বাবা।

সায়রা ভাইয়াকে কদমবুসি করে বলল, তুমি ভালো আছ ভাইয়া?

হাফিজ তার মাথায় হাত ছুঁয়ে চুমো খেয়ে বলল, হ্যাঁ ভালো আছি। তুই কেমন আছিস বল। তুই তো বেশ বড় হয়ে গেছিস দেখছি।

সায়রা লজ্জা পেয়ে বলল, আমিও ভালো আছি।

বিলকিস এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকে তাকিয়ে সবুরা বানু বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন বৌমা? যাও, হাফিজের নাশতার ব্যবস্থা কর। ছেলে আমার কতদূর থেকে এল।

বিলকিস যাচ্ছি আম্মা বলে চলে গেল।

সবুরা বানু ছেলেকে বললেন, যা কাপড় বদলে হাত-মুখ ধুয়ে নাশতা খা।

আফিয়া এতক্ষণ অবাক হয়ে সবকিছু দেখছিল। আব্বু চলে যেতে দাদিকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমি কিন্তু গল্প শুনতে শুনতে তোমার কাছে ঘুমাব। আব্বুর কাছে ঘুমাব না।

সবুরা বানু নাতনিকে আদর দিতে দিতে বললেন, তোমাকে কি আমি আব্বুর কাছে ঘুমাতে বলেছি নাকি? তুমি আগেরমতো আমার কাছেই ঘুমাবে। আফিয়া আড়াই বছরের হতে বিলকিস বুকের দুধ ছাড়িয়ে দিয়েছে। সে হাদিসে পড়েছে ছেলেরা দু'বছর আর মেয়েরা আড়াই বছর মায়ের বুকের দুধ খাবে। তার বেশি খাওয়ান নিষিদ্ধ। দুধ ছাড়িয়ে দেয়ার পর থেকে আফিয়া রাতে দাদির কাছে ঘুমোয়।

হাফিজ আসার সময় ভেবেছিল, বিলকিস হয়ত সেইসব আসবাবপত্র আবার বাসায় এনেছে। বাসায় ঢুকে সেইসব এবং টেপ-টিভি নেই দেখে স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত খুশি হল। নিজের রুমে এসে দেখল, বিলকিস লুঙ্গি ও তোয়ালে হাতে নিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে এসে বিলকিস বলে ডেকে তার চিবুক ধরে বলল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছ?

বিলকিস এ ঘরে এসে এতক্ষণ চিন্তা করছিল, কি বলে তার কাছে ক্ষমা চাইবে। হাফিজকে ভুল বুঝে যা অন্যায় করেছে এবং তার মনে যে কষ্ট দিয়েছে, তাতে করে কোন মুখে তার কাছে ক্ষমা চাইবে। এই সব ভাবতে ভাবতে যখন তার চোখ দু'টো পানিতে ভরে উঠল, ঠিক তখনই হাফিজ তার চিবুক ধরে মুখটা তুলে ধরতে বিলকিসের চোখের পানি গাল বেয়ে হাফিজের হাতে গড়িয়ে পড়ল।

হাফিজ বলল, তুমি কাঁদছ কেন? আমি তোমার সঙ্গে দেখা না করে বিদেশ চলে গিয়েছিলাম বলে মনে খুব কষ্ট পেয়েছ তাই না? কিন্তু তুমি কি জান, সে জন্যে আমি কত কষ্ট নিয়ে আজ চার বছর দুর্বিসহ জীবন কাটিয়েছি। তবু সেদিন আমি অন্যায় করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে.....।

বিলকিস তাকে কথাটা শেষ করতে দিল না। লুঙ্গি ও তোয়ালেটা খাটে ছুঁড়ে দিয়ে ডান হাতে তার মুখ চাপা দিয়ে জড়িয়ে ধরে ফুঁফিয়ে উঠে বলল, না, না, তোমার কোনো অন্যায় হয়নি। তোমাকে ভুল বুঝে আমি অনেক বড় গোনাহর কাজ করেছি। তুমি এই নাদান গোনাহগারের কাছে ক্ষমা চেয়ে আরও গোনাহগার করো না। তারপর বসে পড়ে দু'পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, যেদিন হাদিসে পড়লাম,'স্বামী যতদিন স্ত্রীর উপর রাগ করে থাকবে, ততদিন স্ত্রীর কোনো ইবাদৎ আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না।' সেদিন থেকে কেঁদে কেঁদে তওবা করে তোমার কাছে মাফ চাওয়ার তওফিক আল্লাহপাকের কাছে চেয়ে আসছি। বল, তুমি আমাকে মাফ করেছ?

বিলকিসের কথা শুনে হাফিজের চোখেও পানি এসে গেল। তাকে দু'হাতে তুলে বুকে জড়িয়ে ভিজে গলায় বলল, তখন তোমার ব্যবহারে কষ্ট পেলেও মনে রাখিনি। আমি ঐ হাদিস জানতাম। তাই তোমাকে ক্ষমা করে দিয়ে সবর করে আল্লাহর কাছে তোমাকে হেদায়েত দান করার জন্য দো'য়া চেয়েছি। শুধু তুমি অন্যায় করনি, আমিও করেছি। আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুন। তারপর তাকে মুক্ত করে তার শাড়ির আঁচলে দু'জনের চোখ-মুখ মুছে বলল, আর কান্না নয়, এতদিন বিরহের পর তোমার হাসি মুখ দেখতে চাই।

বিলকিস বলল, শুধু যে কান্না পাচ্ছে, হাসব কি করে?

হাফিজ বলল, সব কিছু ভুলে আমাকে জড়িয়ে ধরে অসংখ্যবার চুমো খেতে থাক, তা হলে সাকসেসফুল হতে পারবে।

বিলকিস হেসে ফেলে বলল, আফিয়া এসে পড়তে পারে।

হাফিজ বলল, আম্মা তাকে এখন আসতে দেবে না। কথা শেষ করে বিলকিসকে জড়িয়ে ধরে আদরে আদরে অস্থির করে তুলল।

বিলকিস চুপ করে থাকল না, সে আদরের প্রতিদানে মেতে উঠল। যখন বুঝতে পারল, স্বামীর মতিগতি অন্যদিকে ধাবিত হচ্ছে তখন নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে করতে বলল, এই দুষ্ট কি হচ্ছে? সময় কি পালিয়ে যাচ্ছে? আফিয়া তোমার সঙ্গে নাশতা খাওয়ার জন্যে এসে পড়তে পারে। তা ছাড়া কতদূর থেকে জার্নি করে এসেছ, সে কথা ভুলে গেছ বুঝি?

হাফিজ তার কথা কর্ণপাত না করে আদর দিতে দিতে বলল, পুরুষ হলে বুঝতে, দীর্ঘ বিরহের পর স্ত্রীকে কাছে পেলে স্বামীর মনের অবস্থা কি রকম হয়?

বিলকিস বলল, আর স্ত্রীর মনের অবস্থা বুঝি কিছু হয় না?

তা হলে বাধা দিচ্ছ কেন?

কারণ, স্বামীরা এ ব্যাপারে সতর্কতার কথা ভুলে গেলেও স্ত্রীরা ভুলে না। খেয়াল করেছ, এক্ষুনি মাগরিবের আযান হবে?

হাফিজ তাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, সরি, সে কথা সত্যি আমি খেয়াল করিনি।

এরপর হাফিজ ও বিলকিস তাদের কাঙ্ক্ষিত জীবন ফিরে পেয়ে বেশ সুখে দিন কাটাতে লাগল। সায়রা বি.এ. পাস করার পর মায়ের মতামত নিয়ে জাহিদ নামে একটা এম.এ. পাস ছেলের সঙ্গে হাফিজ তার বিয়ে দিয়ে দিল। জাহিদকে হাফিজ জয়দেবপুরে সিমেন্ট-রডের দোকান করে দিয়েছে। জাহিদের দেশ পাবনা। তার বাবা মতিঝিল জনতা ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার। ওনার তিন ছেলে ও দুমেয়ে। জাহিদ সবার ছোট। বড় ভাইয়েরা চাকরি করে। ভাই-বোন সকলের বিয়ে হয়ে গেছে। সায়রা মাঝে মাঝে কিছু দিনের জন্য শ্বশুর বাড়িতে থাকলেও বেশির ভাগ সময় হাফিজের কাছে থাকে। বোনের বিয়ে দেয়ার পর হাফিজ বাসার কাছাকাছি দশ কাঠা জমি কিনে চারতলার ফাউণ্ডেশন দিয়ে বাড়ি তৈরীর কাজ শুরু করল। বিলেত থেকে ফেরার পর হাফিজ অফিস থেকে গাড়ি পেয়েছে। ড্রাইভার রাখেনি। নিজে ড্রাইভ করে। যদিও কোম্পানি তাকে ড্রাইভার রাখার অনুমতি দিয়েছিল।

আফিয়া বেশ বড় হয়েছে। সে এখন ক্লাস ফোরে পড়ে। ডিসেম্বর মাসে আফিয়ার পরীক্ষা হয়ে যেতে আব্বুর কাছে কক্সবাজার বেড়াতে যাওয়ার জিদ ধরল।

হাফিজ বাড়ি তৈরীর কাজে হাত দিয়েছে বলে যাওয়ার ইচ্ছা না থাকলেও মেয়ের জিদে অফিস থেকে কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে স্ত্রী ও মেয়েকে সঙ্গে করে রওয়ানা হল। কক্সবাজারে পাঁচদিন ও রাঙ্গামাটিতে দু'দিন বেড়িয়ে ফিরে আসার সময় কুমিল্লার ইলিয়টগঞ্জের ব্রীজের কাছে এক্সিডেন্ট হল।

হাফিজ ব্রীজের কাছে একটা বাস দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গাড়ির স্পীড কমিয়ে ডান দিকে সাইড কেটে সামনে থেকে কোনো গাড়ি আসছে কিনা দেখতে গেল। একটু আগে সে যে ট্রাকটাকে ওভারটেক করে এসেছিল, সেই ট্রাকের ড্রাইভার মনে করল, প্রাইভেট কারটা যখন সাইড কেটেছে তখন নিশ্চয় বেরিয়ে যাবে। তাই সে স্পীড না কমিয়ে আসতে লাগল।

হাফিজ সামনে থেকে গাড়ি আসতে দেখে ব্রেক করে গাড়ি থামিয়ে ফেলল। ঠিক সেই সময় পিছনের ট্রাকটা এসে হাফিজের গাড়ির পিছনে ধাক্কা মেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ধাক্কা খেয়ে হাফিজের গাড়ি উল্টে গিয়ে রাস্তার ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে প্রায় বিশ-ত্রিশ ফুট নিচে খালে পড়ে গেল। তখন গ্রীষ্মকাল। খালে বেশি পানি না থাকলেও পাঁকে পুঁতে গিয়ে গাড়ির ছাদ পর্যন্ত পানি ভরে গেল। চারদিক থেকে লোকজন হায় হায় করে সেদিকে ছুটে এল। আর অনেকে ট্রাকটা ঘেরাও করে ড্রাইভার ও হেলপারকে গাড়ি থেকে নামিয়ে মারধর করতে লাগল। ডিউটিরত পুলিশ জানতে পেরে তাদেরকে পাবলিকের হাত থেকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেল।

এদিকে লোকজন হাফিজদের সবাইকে গাড়ি থেকে বের করার চেষ্টা করল। বিলকিস ও আফিয়াকে সহজে বের করতে পারলেও হাফিজকে পারল না। ধাক্কা খেয়ে গাড়ির স্টীয়ারিং হুইল হাফিজের পেটে চেপে বসে গেছে। শেষে বহু লোক গাড়িটা টেনে খালের উপরে তুলল। তারপর হাফিজকে টেনে বের করার চেষ্টা করল। হাফিজ অনেক আগেই অজ্ঞান হয়ে গেছে। তার উপর অনেকক্ষণ পানির মধ্যে ডুবে ছিল। তাকে টেনে যত বের করার চেষ্টা করতে লাগল তত তার নাক মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোতে থাকে। শেষে স্টীয়ারিং হুইল ভেঙ্গে বের করার পর তাদের সবাইকে অন্য একটা গাড়িতে করে ঢাকা মেডিকেলে আনা হল।

বিলকিস ও আফিয়া আহত হলেও তেমন গুরুতর কিছু হয়নি। তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হল। কিন্তু হাফিজ বাঁচল না। মেডিকেলে আনার কয়েক ঘণ্টা পর মারা গেল।

খবর পেয়ে জাহিদ সায়রা ও সবুরা বানুকে নিয়ে যখন মেডিকেলে এল, তার আগে হাফিজ মারা গেছে। রকিব সাহেবও খবর পেয়ে বাসার সবাইকে নিয়ে এসে দেখলেন, বিলকিস পাথরের মূর্তির মতো স্বামীর বেডে পায়ের দিকে বসে রয়েছে। আফিয়া মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। সবুরা বানু মেঝেতে বসে অনুচ্চস্বরে বিলাপ করে কাঁদছেন। সায়রাও মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। আর জাহিদ রুমালে চোখের পানি মুছছে।

শাফিয়া বানু এগিয়ে এসে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বিয়ানকে প্রবোধ দিতে লাগলেন। ইশিতা আপাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল। রকিব সাহেবের ও হাসানের চোখ থেকে পানি পড়তে লাগল।

এক সময় রকিব সাহেব জাহিদ ও হাসানকে লাশ নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলে সবাইকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

হাসান ও জাহিদ ডাক্তারের পরামর্শমতো হাফিজের লাশ নেয়ার ব্যবস্থা করে সবাইকে নিয়ে জয়দেবপুরে ফিরল। তারপর দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করল।

হাফিজের মৃত্যুর খবর পেয়ে অফিসের অনেক স্টাফ এবং খোদ সাহেব ও মেম সাহেব পর্যন্ত এলেন. হাফিজের মৃত্যুতে সাহেব খুব দুঃখ পেলেন। সবাইকে প্রবোধ দিয়ে সমবেদনা জানালেন। তিনি জাহিদকে চিনেন। সায়রার বিয়ের সময় হাফিজ অফিসের স্টাফদের ও সাহেব মেম সাহেবকে দাওয়াত করেছিল। ফিরে আসার সময় জাহিদকে বললেন, পরে আপনি একবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর বিলকিস বেশ কিছুদিন কারো সঙ্গে কোনো কথা বলেনি। আফিয়া যখন তাকে জড়িয়ে ধরে আব্বুর কথা জিজ্ঞেস করে তখন শুধু তাকে প্রবোধ দেয়ার জন্য বলে, কাঁদিস না মা, তোমার আব্বু আল্লাহপাকের কাছে চলে গেছে। কাঁদলে তিনি বেজার হবেন। তারপর মেয়েকে বুকে চেপে ধরে চোখের পানি ফেলতে থাকে।

প্রায় মাসখানেক পর জাহিদ হাফিজের অফিসে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করল।

সাহেব বললেন, হাফিজের কাছে শুনেছি তার স্ত্রী গ্র্যাজুয়েট। তাকে আমি আমার অফিসে চাকরি দিতে চাই। যদি তিনি রাজি থাকেন, তা হলে একদিন সঙ্গে করে নিয়ে আসুন। আমি তার সঙ্গে কথা বলব।

জাহিদ ফিরে এসে বিলকিসকে সাহেবের কথা জানাল।

বিলকিস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আরও কয়েকদিন পর আমি সাহেবের সঙ্গে দেখা করব।

স্বামীর মৃত্যুর কুলখানি করার পর বিলকিস বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে একদিন বোরখা পরে জাহিদকে নিয়ে অফিসে সাহেবের কাছে গেল। সাহেব জাহিদকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে বিলকিসকে বললেন, আপনার স্বামী আদর্শ চরিত্র ও কর্মদক্ষতার গুণে অল্পদিনের মধ্যে এত বড় পদে উপনীত হয়েছিলেন এবং সমস্ত স্টাফদের কাছে ও আমার কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। আপনি তার শিক্ষিতা স্ত্রী, তাই আমি আপনাকে হাফিজের পোস্টে নিয়োগ করতে না পারলেও সম্মানজনক পদে নিয়োগ করার ইচ্ছা করেছি। যদি আপনি চাকরি করতে না চান, তা হলে হাফিজের প্রফিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা দেয়ার ব্যবস্থা করব। আর টাকা পাওয়ার পর কোম্পানির আইন অনুযায়ী কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হবে। সেই সঙ্গে গাড়িটাও অফিসে জমা দিতে হবে।

বিলকিস চিন্তা করল, চাকরি না করলে অনেক সমস্যায় পড়তে হবে। সেই সব সমস্যা সমাধানের জন্য বাবার সাহায্য নিতে হবে। তা ছাড়া বাবা যখন চাকরি করতে বলল তখন করাই উচিত।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে সাহেব বললেন, আপনি জাহিদের কাছে চাকরির কথা শুনে যখন এলেন তখন ভাবলাম আপনি রাজি আছেন। চুপ করে আছেন কেন? কিছু বলুন।

বিলকিস বলল, আপনার মহানুভবতার কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই। রাজি না হলে আপনাকে ছোট করা হবে। আমি আপনার কথা মেনে নিলাম।

সাহেব বললেন, থ্যাংক ইয়ুই মাই ডিয়ার ইয়ং লেডী। এই উত্তরই আমি আপনার কাছে আশা করেছিলাম। ঠিক আছে, আপনি আসুন। দু'একদিনের মধ্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাবেন।

কয়েকদিন পর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়ে বিলকিস চাকরিতে জয়েন করল। ছেলের মৃত্যুর পর সবুরা বানুর শরীর দিন দিন ভেঙে পড়তে লাগল। বিলকিস বড় বড় ডাক্তার এনে শাশুড়ীকে দেখিয়েও কিছু হল না। ছ'মাসের মধ্যে মারা গেলেন। যথা সময়ে বিলকিস শাশুড়ীর রুহের মাগফেরাতের জন্য যা কিছু করার করল।

হাফিজের মৃত্যুর পর বাড়ি তৈরীর কাজ বন্ধ ছিল। সবুরা বানুর মৃত্যুর দু'মাস পর জাহিদ একদিন বিলকিসকে বাড়ি তৈরি কথা জিজ্ঞেস করল। বিলকিস টাকার কথা

চিন্তা করে বলল, কয়েকদিন পর জানাব। সেদিন অফিসে গিয়ে স্বামীর সার্ভিস বুক চেক করে জানতে পারল, সে আজ পর্যন্ত কোনো টাকা তুলেনি। বাসায় ফিরে ব্যাংকের কাগজপত্র দেখে বুঝতে পারল, সে চাকরির প্রথম থেকে ব্যাংকে কারেন্ট একাউন্ট খুলে টাকা জমিয়ে এসেছে। এতদিন যা কিছু করেছে, তা সব ব্যাংকের জমান টাকা তুলে করেছে।

বিলকিসও ব্যাংক থেকে টাকা তুলে বাড়ির কাজ শুরু করল। দোতলার কাজ কমপ্লিট করে কোম্পানির কোয়ার্টার ছেড়ে নিজের বাসায় চলে এল। নিচতলায় সায়রা ও জাহিদ আর উপরতলায় বিলকিস মেয়েকে নিয়ে থাকতে লাগল।

দেখতে দেখতে দিন মাস ও বছর গড়িয়ে চলল। বিলকিস এমন পোশাকে অফিসে যায়, কেউ তার পা পর্যন্ত দেখতে পায় না। শুধু চোখ দুটো খোলা থাকলেও রঙিন চশমা সব সময় ব্যবহার করে। এভাবে এক যুগ অতিবাহিত হয়ে গেল। মাঝে মাঝে বিলকিস নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ ভাবে। কোনো কিছু ভালো লাগে না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন মুটিয়ে যাচ্ছে। বেশি পরিশ্রম করলে হাঁপিয়ে উঠে। বেশ কিছু দিন থেকে হাই প্রেসার হয়েছে। একেক সময় হাফিজের কথা মনে হলে খুব উদাস হয়ে পড়ে। চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়তে থাকে। তখন তার মন খুব খারাপ হয়ে যায়।

আফিয়া অনেক বড় হয়েছে। তাকে মনের মতো করে গড়েছে। সে এখন জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে পলিটিক্যাল সায়েন্সে অনার্স করছে।

আফিয়া স্কুলে পড়ার সময় আম্মুর ঐ রকম অবস্থা দেখে প্রথম প্রথম অনেক প্রশ্ন করত। পরে বড় হয়ে বুঝতে পারে, আব্বা অসময়ে মারা গেছে বলে আম্মুর এই অবস্থা। কখনও কাছে গিয়ে আম্মুকে নানান কথা বলে তার মন অন্যদিকে ফেরাবার চেষ্টা করে। আবার কখনও কিছু না বলে সরে আসে।

বিলকিস সারারাত বিগত দিনের কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভোরে মোয়াজ্জিনের আযান শুনে তার ঘুম ভেঙে গেল। অযু করে এসে ফজরের নামায পড়ে ক্বুরআন তেলাওয়াত করতে লাগল। সূর্য ওঠার কিছুক্ষণ পর এশরাকের নামায পড়ে মর্জিনাকে ডেকে বলল, আফিয়াকে ডেকে দাও।

প্রতিদিনের মতো আজও ফজরের নামাযের পর আফিয়া ক্বুরআন তেলাওয়াত করে পড়তে বসেছে। এমন সময় মর্জিনা এসে বলল, বেগম সাহেব আপনাকে ডাকছেন।

আফিয়া মর্জিনাকে শুধু খালা বলে ডাকে। বলল, খালা তুমি যাও আমি আসছি। একটু পরে আফিয়া এসে দেখল, আম্মু নামায পাটিতে বসে তসবিহ পড়ছে। আফিয়া জানে একদম চাশতের নামায পড়ে উঠবে। তারপর গোসল করে নাশতা খেয়ে অফিস যাবে।

বিলকিস মেয়েকে দেখে তসবিতে চুমো খেয়ে একপাশে রেখে তাকে বসতে বলল।

আফিয়া আম্মুর পাশে বসে আতংকিত হয়ে বলল,. তোমার কি আবার শরীর খারাপ লাগছে?

বিলকিস মেয়ের মুখে আতঙ্কের ছাপ দেখে খুব নরম সুরে বলল না, শরীর খারাপ লাগছে না। তারপর তার গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, ছেলেমেয়ে ভুল বা অন্যায় করলে

প্রত্যেক গার্জেনই শাসন করে। তুই এখন বড় হয়েছিস, ভার্সিটিতে পড়ছিস। তোকে শাসন করব কি করে? তাই দু'চারটে কথা বলে সাবধান করতে চাই।

আফিয়া বলল, আমি কোনো ভুল বা অন্যায় করেছি?

না করলেও সেই পথে অগ্রসর হচ্ছিস। নিজের ভুল বা অন্যায় নিজের চোখে ধরা পড়ে না, অন্যের চোখে পড়ে।

বেশ তো আম্মু বল, আমি কি ভুল পথে চলেছি।

কাল যে ছেলেটার কথা বললি, তার সঙ্গে তোর কত দিনের পরিচয়?

তা প্রায় এক বছরের বেশি হবে।

তার সঙ্গে কি তুই প্রতিদিন দেখা করিস?

তাকে প্রতিদিন পাব কোথায়? যা পড়া-পাগল ছেলে। ভার্সিটিতে আসে শুধু ক্লাস করার জন্য। তারপর তার টিকিও দেখা যায় না। বাসায় গিয়ে সব সময় পড়ে। মাঝে-মধ্যে লাইব্রেরীতে বসে নোট করে। সেই সময় যদি আমি লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়ি, তা হলে দেখা হয়। জান আম্মু, পড়াশোনার ব্যাপারে সাহায্য চাইলে কিছু না বলে যথাসাধ্য সাহায্য করে। কিন্তু অন্য কোনো কথা বললে খুব রেগে যায়। তখন বলে, আজেবাজে কথা বলে সময় ব্যয় করার মতো সময় আমার নেই। দরকার না থাকলে চলে যান। একদিন বললাম, আপনাকে দরকার মতো পাওয়া যায় না। বাসার ঠিকানা দেবেন? যেই না বলেছি, অমনি রেগে গিয়ে কিছুক্ষণ কোনো কথা বলল না। তারপর বলল, আর কোনো দিন একথা বলবেন না। নচেৎ আপনাকে আর নোট দেব না। বললাম, আপনার এত অহংকার কেন? মানুষের অংহকার থাকা ভালো নয়, অহংকার একমাত্র আল্লাহ পাকের সিফাত। মানুষের তা থাকা হারাম। বলল, আমি তা জানি। আমার অহংকার আছে কিন তা আল্লাহপাক জানেন। যাকগে, একটা কথা বলুন তো, আমি অহংকারী জেনেও আপনি আমার কাছে আসেন কেন? তারপর আর দাঁড়ায় নি।

তারপরও তুই তার সঙ্গে দেখ করিস?

আফিয়া আম্মার কথা শুনে চুপ করে রইল। কি করে বলবে আমি তাকে ভালোবাসি।

চুপ করে আছিস কেন? আমার কথার উত্তর দে।

আফিয়া আম্মু বলে বিলকিস বানুকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল। বিলকিসের তখন নিজের প্রথম জীবনের কথা মনে পড়ল। সামলে নিয়ে বলল, ছেলেটাকে একবার আমার কাছে নিয়ে আসবি।

আফিয়া নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। যে আম্মু তাকে ছেলেবেলা থেকে কোনো ছেলের সঙ্গে মেলামেশা বা বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করে এসেছে, যে আম্মু ধর্মের প্রতিটি বিধিনিষেধ কঠোরভাবে নিজেও যেমন মেনে চলে তাকেও সেই রকম অনুশীলন দিয়ে মানুষ করেছে, অনেকবার টেপ-টিভি কিনতে বলেও যে আম্মুকে রাজি করাতে পারেনি, যে আম্মু তাকে পাশের ফ্ল্যাটে টিভি দেখতে যেতে দেয়নি, সেই আম্মু কিনা ছেলেটাকে আমি ভালোবাসি বুঝতে পেরে তাকে বাসায় নিয়ে আসতে বলল। ভাবল, তাকে অপমান করবে বলে আনতে বলল না তো?

বিলকিস বলল, আমাকে ছেড়ে দিয়ে বস।

আফিয়া আম্মুকে ছেড়ে দিয়ে মাথা নিচু করে বসল।

কি রে, ছেলেটাকে আনবি তো?

সে এখন আসতে পারবে না। তার সামনে পরীক্ষা, যা পড়ুয়া ছেলে। পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার দেখা পাওয়া মুশকিল।

পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর না হয় নিয়ে আসবি। এখন যা পড়তে বস।

আফিয়া উঠে নিজের রুমে চলে গেল।

পরীক্ষার দু'মাস আগে থেকে নিয়াজ কোথাও বেরোয়নি। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ভাবল, এবার একবার দেশে গিয়ে কয়েকদিন থাকবে। হঠাৎ তার আফিয়ার কথা মনে পড়ল। সেদিনের পর থেকে অনেক দিন তার সাথে দেখা হয়নি। ভেবে রাখল, একদিন ভার্সিটিতে গিয়ে দেখা করে তার নোটগুলো দিয়ে আসবে।

এদিকে বিলকিসের বুকের ব্যাথাটা ভালো হচ্ছে না। মাঝে মাঝে বেশ জ্বালায়। একদিন তিনি মেয়েকে বললেন, কই রে, সেই ছেলেটাকে একবার আনলি না?

আফিয়া বলল, তার এতদিন পরীক্ষা চলছিল। সেদিনের পর থেকে আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি। দু'দিন হল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এবার হয়ত তার সঙ্গে দেখা হতে পারে। হলে নিয়ে আসব।

আরও দু'তিন দিন পার হয়ে যেতেও যখন নিয়াজ তার সঙ্গে দেখা করল না তখন আফিয়া অস্থির হয়ে উঠল। আম্মুর শরীরের কথা চিন্তা করে কি করবে না করবে ভেবে ঠিক করতে পারল না। তার বাসার ঠিকানাও জানে না। নচেৎ বাসায় চলে যেত। একদিন রাতে শোবার সময় ড্রেস চেঞ্জ করতে গিয়ে গলার কবজটা দেখে নিয়াজের কথা মনে পড়ল, 'যখন কোনো বিপদে পড়বে তখন কবজটা খুলে পড়লে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার সমাধান পাবে।' ভাবল, আম্মুর শরীর দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। আগের থেকে ঘন ঘন বুকের ব্যাথাটা হচ্ছে। নিয়াজকে নিয়ে আসার জন্য বারবার তাগিদ দিচ্ছে। চিন্তা করল, এখন যদি কবজটা খুলি, তা হলে কি অন্যায় হবে? এই কথা চিন্তা করতে করতে সিদ্ধান্ত নিল, কবজটা খুলবে। মনে মনে আল্লাহকে জানাল, তুমি আমার মনের খবর জান, তবু যদি অন্যায় হয়, তা হলে মাফ করে দিও। তারপর গলা থেকে কবজটা নিয়ে খুলে দেখল, খুব পাতলা দু'টো কাগজের টুকরো, একটায় আয়াতুল কুরসী লেখা। আর অন্যটায় কয়েকটা কথা লেখা– "প্রথম পরিচয়ের দিন তোমার নাম 'আফিয়া ওয়াসিমা' জেনে এবং তোমাকে দেখে ও তোমার কথাবার্তায় এত মুগ্ধ হয়েছিলাম যে, তক্ষুনি আল্লাহপাকের কাছে ফরিয়াদ করেছি তুমি আফিয়া ওয়াসিমাকে তার নামের অর্থমতো পুণ্যবতী সুন্দরী করে আমার স্ত্রীরূপে কবুল কর। আমি আজীবন তার পথ চেয়ে থাকব। আফিয়া তুমি কি আমাকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করে ধন্য করবে? যদি কর, তা হলে এক্ষুনি আমার কাছে চলে এস। তোমার বিপদ দূর করার জন্য আল্লাহ পাকের কসম খেয়ে বলছি, জীবন বাজি রাখব।" সবশেষে ঠিকানা লেখা।

পড়া শেষ করে আফিয়া কাগজটায় চুমো খেয়ে আল্লাহর শোকর গুজারি করতে গিয়ে তার চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল। বিড়বিড় করে বলল, নিয়াজ, আমি তোমার

মনের খবর জানতাম। কিন্তু এ যে ভাবতে পারছি না। দো'য়া করল, "আল্লাহ গো, তুমি আমাদের মনের বাসনা পূরণ কর। আর কালকে যেন তাকে সঙ্গে করে আম্মুর কাছে নিয়ে আসতে পারি।"

পরের দিন সকালে নাশতা খেয়ে ক্লাস কামাই করে নিয়াজের বাসায় রওয়ানা দিল।

নিয়াজ সাভারের একটা মেসে থাকে। সে দেশে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে ভাবল, আজ ভার্সিটিতে গিয়ে নোটগুলো আফিয়াকে দিয়ে আসবে। এই মনে করে সে নোটগুলো নিয়ে ভার্সিটি যাওয়ার জন্য বাসা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠেছে, এমন সময় আফিয়াকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে খুব অবাক হয়ে এগিয়ে এল। তারপর সালাম দিয়ে বলল, আল্লাহপাকের কি মর্জি, আমি দেশে যাওয়ার আগে নোটগুলো তোমাকে দেয়ার জন্যে তোমার কাছে যাচ্ছিলাম। আর তুমি কিনা এসে গেলে। যাক ভালোই হল, কষ্ট করে আমাকে আর যেতে হল না। নোটের খাতাগুলো তার হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছ? সরি, আছেন? এতক্ষণ যে তুমি করে বলছিল তা খেয়াল করেনি।

নিয়াজকে তুমি করে বলতে শুনে আফিয়ার মন আনন্দে ভরে গেছে। শেষে আপিনি সম্বোধন শুনে সালামের প্রতি উত্তর দিয়ে বলল, আপনি করে আর বলতে হবে না। মনের সত্যকে কত দিন চেপে রাখবে? ভালো মন্দের খোঁজ এতদিন যখন করনি তখন আর জিজ্ঞেস করে কি হবে? ওসব কথা বাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠ।

আফিয়াকে দেখে এবং কথা শুনে নিয়াজ ভাবল, নিশ্চয় কোনো বিপদে পড়ে কবজটা খুলে পড়েছে। তা না হলে আফিয়া আমার ঠিকানা জানল কেমন করে? আর আমাকে তুমি করেই বা বলবে কেন? বিপদের কথা ভেবে মনে মনে আতঙ্কিত হলেও তা বাইরে প্রকাশ না করে বলল, কেন?

এক জায়গায় যেতে হবে। যাওয়াটা তোমার খুব জরুরী। সেই জন্যেই তো নিতে এলাম।

কোথায় যেতে হবে?

আফিয়া গাড়িতে উঠে বলল, আগে উঠে এস, তারপর বলছি।

নিয়াজ গাড়িতে উঠে বলল, এবার বলল কোথায় নিয়ে যাবে?

গেলেই জানতে পারবে। আচ্ছা, তুমি তোমার আম্মুকে কদমবুসি কর?

হ্যাঁ, করি। হঠাৎ এ রকম প্রশ্ন করলে কেন?

আমি তোমাকে একজন মহিলার কাছে নিয়ে যাব। তাকে তুমি কদমবুসি করবে।

যাকে চিনি না, জানি না, তাকে কদমবুসি করতে যাব কেন?

আহ, তর্ক করো না। তার কাছে গেলে তো চেনা-পরিচয় হবে।

নিয়াজ আর কিছু না বলে চিন্তা করল, আফিয়া কি তার মায়ের কাছে নিয়ে যাচ্ছে? জিজ্ঞেস করল, তোমার আব্বা কি করেন?

আমার আব্বা নেই। আমি যখন ক্লাস ফোরে পড়ি তখন মারা গেছেন। তিনি একটা বিদেশী ফার্মের ম্যানেজার ছিলেন।

তোমরা কয় ভাই বোন?

আমি একা। আমার কোনো ভাইবোন নেই। কথা শেষ করে আফিয়া হাতের পিঠে চোখ মুছল।

তাই দেখে নিয়াজ বলল, দুঃখিত, একথা জিজ্ঞেস করে তোমার মনে দুঃখ দিলাম। সেজন্যে ক্ষমা চাইছি।

আফিয়া বলল, না, না, ঠিক আছে। তুমি তো আমার মনে দুঃখ দেয়ার জন্যে জিজ্ঞেস করনি, জানার জন্য করেছ। ক্ষমা চাইছ কেন?

এরপর আর কেউ কোনো কথা বলল না। গাড়ি একদম আফিয়াদের বাসার গেটে এসে থামল।

আফিয়া গাড়ি থেকে নেমে নিয়াজকে সাথে করে উপরে এসে ড্রইংরুমে ঢুকল। তারপর বলল, তুমি বস, আমি আসছি।

বিলকিসের বেশ কিছুদিন থেকে শরীর খারাপ যাচ্ছে বলে ছুটি নিয়ে রেস্টে আছে। বসে বসে তাজকেরাতুল আম্বিয়ার প্রথম খণ্ড পড়ছিল।

আফিয়া তার কাছে এসে সালাম দিয়ে বলল, আম্মা সেই ছেলেটা এসেছে।

বিলকিস বইটা বন্ধ করে সালামের উত্তর দিয়ে বলল, তাই নাকি?

আফিয়া বলল, হ্যাঁ আম্মু। তাকে ড্রইংরুমে বসিয়েছি।

বিলকিস গায়ের কাপড় ঠিক করে একটা চাদর গায়ে মাথায় দিয়ে মর্জিনাকে ডেকে ড্রইংরুমে একজনের চা-নাশতা পাঠাবার কথা বলে আফিয়াকে বলল, তুইও আমার সঙ্গে চল।

আফিয়া আম্মুর সঙ্গে ড্রইংরুমে এসে নিয়াজকে বলল, আমার আম্মু।

নিয়াজ দাঁড়িয়ে সালাম দিল। তারপর এগিয়ে এসে পায়ে হাত দিয়ে কদমবুসি করল।

বিলকিস নিয়াজকে দেখে খুশি হল। যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি চেহারা।

সালামের উত্তর দিয়ে বলল, থাক বাবা থাক। আল্লাহ তোমাকে হায়াতে তৈয়েবা দান করুন। দাঁড়িয়ে কেন, বস। তারপর নিজে বসে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কি?

নিয়াজ আহাম্মদ।

তোমার আব্বার নাম?

বসির আহাম্মদ।

বিলকিস মেয়ের মুখে শুনেছিলেন, তার বাড়ি রংপুরে। তার ও তার বাবার নাম মিলে যেতে একটু অবাক হয়ে বলল, রংপুরে কোথায় তোমাদের বাড়ি।

জব্বলপুর গ্রামে।

এবার বিলকিস নিশ্চিন্ত হল। এই সেই ছেলে-যাকে হাফিজ ও সে লেখাপড়া করার জন্যে সাহায্য করছে। জিজ্ঞেস করল, পরীক্ষা কেমন হল?

আল্লাহপাকের রহমতে ভালো।

আচ্ছা, তুমি কি তাকে জান, যে তোমাকে পড়ার খরচের জন্য প্রতি মাসে তিন'শ করে টাকা পাঠায়?

কথাটা শুনে নিয়াজ চমকে উঠে ভাবল, যে কথা আমি, আম্মা ও আব্বা ছাড়া কেউ জানে না, উনি জানলেন কি করে? তা হলে কি ইনি.....কথাটা সে আর চিন্তা করতে পারল না।

বিলকিস তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল, কিছু বলছ না কেন?

জি না, আমি যেমন চিনি না, তেমনি কখনও দেখেনি। তবে আম্মার কাছে শুনেছি, ছোটবেলায় নাকি আমি একবার দেখেছি।

তার নাম জান?

জি, হাফিজুর রহমান।

তার পরিচয় তুমি জান?

জি জানি। ওনার দেশের বাড়ি আমাদের গ্রামে। উনি আব্বার ছেলেবেলার বন্ধু ছিলেন। উনি ঢাকায় থাকতেন তাও জানি।

তুমি তো অনেক দিন ঢাকায় থেকে লেখাপড়া করছ, ওনার সঙ্গে দেখা করনি কেন?

আব্বা নিষেধ করেছিলেন।

কেন বলতে পার?

জি না।

মর্জিনা চা-নাশতা নিয়ে এলে বিলকিস মেয়েকে বলল, তুই পরিবেশন কর।

আফিয়ার প্রথম দিকে ভয় ও আতঙ্কে বুক ঢিপ-ঢিপ করছিল। নিয়াজের সঙ্গে কথা বলে আম্মাকে রাগতে না দেখে তা দূর হয়ে গেছে। এখন আম্মার কথা শুনে এগিয়ে এসে নাশতা পরিবেশন করল।

বিলকিস বলল, নাশতা খাও। আমার শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না। আমি যাই বলে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, আবার এস, কেমন?

নিয়াজ দাঁড়িয়ে বলল, জ্বি আসব? তারপর আবার বলল, আপনার কি হয়েছে?

বিলকিস বলল, কি আর হবে বাবা, আমি প্রেসারের রোগী। তারপর চলে গেল।

নিয়াজ আফিয়াকে জিজ্ঞেস করল, তোমার আম্মা প্রেসারের রোগী, ভালো করে চিকিৎসা করান হচ্ছে না?

আফিয়া বলল, তা আবার হচ্ছে না। তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন, নাশতা খাবে তো?

নিয়াজ বসে বলল, আমি একা খাব নাকি? তুমিও এস।

আজ নয়। যেদিন আল্লাহ একপাত্রে খাওয়াবেন, সেদিন থেকে শুধু নাশতা নয়, সবকিছু খাব।

আজ থেকে না হয় শুরু করে দাও।

আল্লাহ ও তাঁর রসুলের (দঃ) হুকুমের পরিপন্থি না হলে খেতাম।

মারহাবা, মারহাবা। তুমি তো দেখছি আমার চেয়ে বেশি এলেম হাসিল করেছ।

বেশি না কচু, এ কথা সবাই জানে।

তুমি একজন তর্কবাগীশ।

আফিয়া হেসে উঠে বলল, বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে খেতে শুরু কর। সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

নিয়াজ বিসমিল্লাহ বলে খেতে শুরু করে বলল, তোমার আম্মা কিন্তু খুব ভালো।

আর আমি বুঝি খুব খারাপ?

ভালোর পেটে ভালোই হয়। কিন্তু তুমি....বলে থেমে গেল।

কি হল থামলে কেন বল?

নিয়াজ খাওয়া বন্ধ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি অনন্যা প্রেমিকা।

আফিয়া লজ্জা পেয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না। মাথা নিচু করে বলল, তুমিও অনন্য প্রেমিক। তারপর আবার বলল, আম্মুর মতো ভালো মেয়ে সারা দুনিয়ায় আর আছে কিনা জানি না।

প্রত্যেক ছেলেমেয়ে নিজের মাকে তাই জানে।

হয়ত তোমার কথা ঠিক। জান, প্রথমদিকে আমার খুব ভয় ভয় করছিল।

আমারও।

তুমি ভয় পাবে কেন?

বা-রে?, প্রেমিকার গার্জেনের সঙ্গে হঠাৎ পরিচয় করতে ভয় করবে না?

এখন আর বুঝি করছে না?

তোমার না করে থাকলে আমারও করছে না।

তা হলে শেস মেষ স্বীকার করলে, আমি তোমার প্রেমিকা?

না করে উপায় কি? তুমি যখন কবজটা খুলেই ফেলেছ।

কবজ খুলেছি বলে তুমি কি রাগ করেছ? জান, আম্মুর শরীর খারাপ, সে তোমাকে নিয়ে আসার জন্য তাগিদ দিচ্ছিল, তুমিও আসছিলে না। তোমার ঠিকানাও জানতাম না যে তোমাকে ডেকে আনব। কি করব ভেবে ঠিক করতে না পেরে অস্থির হয়ে পড়ি। শেষে তুমি কবজ দেয়ার সময় যা বলেছিলে তা মনে পড়তে কবজ খুলি।

নিয়াজ বলল, না, রাগ করিনি। তুমি ঠিক সময়মতো খুলেছ। নাশতা খাওয়া শেষ হতে বলল, এবার আসি তা হলে?

এস। আবার কবে আসবে?

দেশে দু'তিন দিন থাকব। ফিরে এসে আসব। তারপর সালাম বিনিময় করে নিয়াজ চলে গেল।

বিলকিস রুমে এসে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে লাগল, এই নিয়াজকেই হাফিজ টাকা পাঠাত। একদিন জামার পকেটে মানি অর্ডারের রশিদ দেখে জিজ্ঞেস করতে হাফিজ বলেছিল, আমার এক গরীব বাল্যবন্ধুর ছেলেকে প্রতি মাসে টাকা পাঠাই। ছেলেটা ছাত্র হিসাবে খুব ভালো। বন্ধুটা অভাবের জন্যে যাতে তার পড়াশুনা বন্ধ করে না দেয়, সে জন্যে ছেলেটার পড়ার খরচ আমি দেব বলে তাকে কথা দিয়েছিলাম। তোমাকেও বলে রাখছি–কোনো কারণে আমি যদি টাকা পাঠাতে না পারি, তা হলে তুমি প্রতি মাসে

পাঠাবে। আর যদি ছেলেটা বড় হয়ে কোনো দিন এখানে আমার অবর্তমানে আসে, তা হলে তাকে গরিবের ছেলে বলে অসম্মান করো না। সেই ছেলে নিয়াজ। ছেলেটার কথাবার্তা শুনে ও তাকে দেখে মনে হল, সত্যিই ছেলেটা রত্ন। হাফিজ ঠিকই চিনেছিল। আর তার মেয়ে আফিয়াও রত্ন চিনতে ভুল করেনি। আফিয়াকে তার হাতে তুলে দিলে সুখীই হবে।

নিয়াজ চলে যাওয়ার পর আফিয়া আম্মুর কাছে এসে তাকে শুয়ে থাকতে দেখে বলল, শরীর কি বেশি খারাপ লাগছে? ডাক্তার খালাআম্মাকে ডেকে আনব?

বিলকিস বলল, না ডাকতে হবে না। এমনি একটু খারাপ লাগছে বলে শুয়ে আছি। তারপর উঠে বসে বলল, নিয়াজ আবার কবে আসবে কিছু বলে গেলে?

আফিয়া বলল, আজকালের মধ্যে দু'চারদিনের জন্য দেশে যাবে। দেশ থেকে ফিরে আসবে বলেছে।

বিলকিস বলল, দো'য়া করি, "আল্লাহ তাকে যেন সহি সালামতে ফিরে আসার তওফিক দেন।" এখন তুই যা কিছু খেয়ে নে।

বিলকিসের শরীর ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে লাগল। একদিন সন্ধ্যার সময় বুকের যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গেল। ডাক্তারের পরামর্শে ঐ রাতেই ক্লিনিকে ভর্তি করা হল। দু'দিন পর জ্ঞান ফিরল।

আফিয়া ও সায়রা সব সময় ক্লিনিকে রয়েছে। রকিব সাহেব বাসার সবাইকে নিয়ে প্রতিদিন দেখে যাচ্ছেন। হাফিজ নিজে ছেলে পছন্দ করে ইশিতার বিয়ে দিয়েছিল। তার স্বামী একজন বিজনেস ম্যাগনেট। তাদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। ইশিতা স্বামী ছেলেমেয়েসহ দেখে যাচ্ছে। জাহিদ দিনে-রাতে কয়েকবার এসে খোঁজ নিচ্ছে।

বিলকিস জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর মেয়েকে জিজ্ঞেস করল, নিয়াজ কি এসেছিল?

আফিয়া বলল, না আম্মু। এখনও হয়ত দেশ থেকে ফিরেনি।

পরের দিন আম্মাকে একটু সুস্থ দেখে আফিয়া তার অনুমতি নিয়ে বাসায় গোসল করতে এসে চিন্তা করল, ক্লিনিকে যাওয়ার আগে একবার নিয়াজের মেসে খোঁজ নিতে হবে। সেই কথা ভেবে গোসল ও খাওয়ার পর নিচে এসেছে, এমন সময় নিয়াজকে আসতে দেখে আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করল। কাছে এলে সালাম দিয়ে বলল, তুমি এসে খুব ভালো করেছ। আমি এক্ষুনি তোমার কাছে যাচ্ছিলাম।

নিয়াজ সালামের উত্তর দিয়ে বলল, কেন, কি হয়েছে?

আফিয়া আম্মুর অসুখের কথা বলে বলল, জ্ঞান ফিরে আসার পর তোমার খোঁজ করছিল। আম্মু ক্লিনিকে আছে চল যাই।

দুপুরে আফিয়া বাসায় চলে যাওয়ার পর রকিব সাহেব ও শাফিয়া বানু এসেছেন। সায়রা আর জাহিদ সেখানেই ছিল। বিলকিস দুপুরের খাওয়ার পর সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, আফিয়ার একটা ছেলেকে ভালোবাসে। সে আফিয়ার আব্বার বাল্যবন্ধুর ছেলে। আফিয়ার আব্বা তাকে ছোটবেলা থেকে লেখাপড়ার খরচ দিয়ে এসেছে। তার কথামতো আমিও এখন পর্যন্ত চালাচ্ছি। কয়েকদিন আগে আফিয়া তাকে সঙ্গে করে

আমার কাছে এনেছিল। তার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পেরেছি, ছেলেটা খুব ভালো। আমি তাকে চিনতাম না। সেদিন তার সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারি। আমার যদি কিছু হয়, তা হলে তোমরা তার সঙ্গে আফিয়ার বিয়ে দিও। আর একটা কথা, ছেলেটা জানে না, আফিয়া তার আব্বার বাল্যবন্ধুর মেয়ে এবং আমরা যে তাকে টাকা-পয়সা দিয়ে লেখাপড়া করাচ্ছি, তাও জানে না। আফিয়াও এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। তোমরাও তাদের দু'জনকে এ সম্বন্ধে কিছু জানিও না। এত কথা বলে বিলকিস ছটফট করতে করতে বলল, বুকের ব্যথাটা আবার বাড়তে শুরু করেছে। আফিয়া এখনও আসছে না। কেন? তোমরা কেউ ডাক্তারকে ডেকে আন।

এমন সময় আফিয়া নিয়াজকে নিয়ে এসে আম্মুকে ছটফট করতে দেখে বলল, আম্মু, বুকের ব্যথাটা কি বেড়েছে?

বিলকিস 'হ্যাঁ' বলে আফিয়ার সঙ্গে নিয়াজকে দেখে শোকর আলহামদুলিল্লাহ বলল। তারপর নিয়াজকে উদ্দেশ্য করে বলল, তুমি এসেছ বাবা? তোমার কথাই এক্ষুনি এদেরকে বলছিলাম। তুমি আমার কাছে এস। নিয়াজ কাছে এলে তার একটা হাত ধরে আফিয়ার একটা হাত নিয়ে তার হাতের উপর রেখে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমি আফিয়াকে নিয়াজের হাতে তুলে দিলাম, তোমরা সাক্ষি থেক। তারপর নিয়াজকে বলল, তুমি একে গ্রহণ করবে– বল?

নিয়াজ বলল, আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছে কেন? আল্লাহ চাহে তো আগে আপনি সুস্থ হোন। তারপর আপনি আফিয়াকে আমার হাতে দেবেন।

বিলকিস বলল, আল্লাহপাক সে সময় বুঝি আমাকে দেবেন না। তাই এখন যা বললাম তাই করো। আর আমার ও আফিয়ার আব্বার যা কিছু রইল, সে সব তোমাদের দু'জনকে দিয়ে গেলাম। তারপর সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, এরা তোমাদের গার্জেন! এদের সঙ্গে পরামর্শ করে সব কিছু করবে। এই কথা বলার পর হাঁপাতে লাগল। একটু সময় নিয়ে বলল, বুকের ব্যথা সহ্য করতে পারছি না। কেউ কি ডাক্তার ডাকতে যায়নি? নিয়াজ ছুটে ডাক্তার ডাকতে গেল। ডাক্তারকে রোগীর সিরিয়াস অবস্থার কথা জানিয়ে তাড়াতাড়ি আসতে বলে ফিরে এসে দেখল, বিলকিস বিড়বিড় করে কলেমা শাহাদাৎ পড়ছে। নিয়াজ বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি চামচে করে পানি খাওয়াতে লাগল। দু'তিন চামচ পানি খেয়ে বিলকিস একবার চমকে উঠে নীরব হয়ে গেল।

এমন সময় ডাক্তার এসে বললেন, আপনারা সরে দাঁড়ান। রোগীর কাছে ভীড় করবেন না। তারপর বিলকিসের নাড়ী ধরে দেখে স্টেথিসকোপ বুকে বসিয়ে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে বললেন, উনি মারা গেছেন। ডাক্তারের কথা শুনে সবাই 'ইন্নল্লিাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজেউন' পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল। আর আফিয়া 'আল্লাহ গো একি হল' বলে আম্মুকে জড়িয়ে ধরে জ্ঞান হারাল।

***